সাপ্তাহিক

নদীর নাম জিয়াভরলি, গুম্ফার নাম তাওয়াং

আনন্দমেলা

২৬ এপ্রিল ২০০০ দশ টাকা

ছোট্ট ইঁদুরের কাণ্ড

সাড়া-জাগানো সিনেমা
'স্টুয়ার্ট লিট্‌ল'।
ছোটদের জন্য আবার
এক জমজমাট কাহিনী।

PARLE
PARLE
MONACO
OVEN FRESH SALTED BISCUITS
মুচমুচে, হালকা মোনেকো
হালকা জমাটি মুহূর্তে
visit us at www.parles.com
everest/2000/PP/11 bn

২৬ বর্ষ ২ সংখ্যা ১৩ বৈশাখ ১৪০৭ ২৬ এপ্রিল ২০০০

আনন্দমেলা

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

প্রচ্ছদকাহিনী

ছোট্ট ইঁদুরের কাণ্ড

৩১ সাড়াজাগানো সিনেমা 'স্টুয়ার্ট লিট্‌ল'। স্টুয়ার্ট এক ছোট্ট ইঁদুরের নাম। একদিন লিট্‌ল-পরিবারের সদস্য হয়ে এল স্টুয়ার্ট। তারপর বাড়িতে তাকে নিয়ে নানা মজার আর অদ্ভুত সব কাণ্ড। সেইসব ঘটনা নিয়ে ছোটদের জন্য আবার এক জমজমাট কাহিনী। এই সিনেমাটি নিয়ে লিখেছেন শমিতা চট্টোপাধ্যায়।

কাছে-দূরে

নদীর নাম জিয়াভরলি, গুম্ফার নাম তাওয়াং

১৪ ভালুকপং থেকে জিয়াভরলি নদী পেরিয়ে বমডিলা, সেখান থেকে আরও একদিনের পথ তাওয়াং গুম্ফা। প্রকৃতি তার সৌন্দর্যের সম্ভার সাজিয়ে বসে আছে পর্যটকদের জন্য। লিখেছেন উৎপল বিশ্বাস।

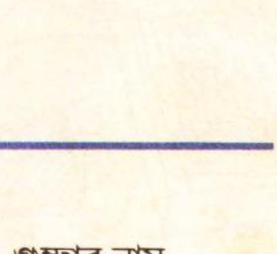

মাধ্যমিকের লেখাপড়া

এবারের বিষয় বাংলা, ভূগোল, ইতিহাস এবং ভৌতবিজ্ঞান

৪০ ২০০১ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতির সময় এখন থেকেই। এই সংখ্যায় আছে বাংলা, ভূগোল, ইতিহাস এবং ভৌতবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং প্রশ্নোত্তর।

খেলাধুলো

৫০০ উইকেটের আগে থামবেন না কোর্টনি ওয়াল্‌শ

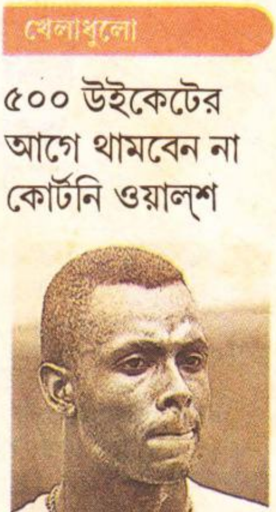

৬০ টেস্টে সবচেয়ে বেশি উইকেট পেয়েছেন যেমন, তেমনই তাঁর সংগ্রহে সবচেয়ে বেশি শূন্য করার রেকর্ডও। এসব ছাপিয়ে উঠেছে ওয়াল্‌শের খেলোয়াড়ি মনোভাব। টেস্টে ৫০০ উইকেট সংগ্রহের দৌড়ে এগিয়ে থাকা ওয়াল্‌শকে নিয়ে লিখেছেন তানাজি সেনগুপ্ত।

অন্যান্য

বিভাগ

বাড়িতে বসেই ইন্টারনেটে করে নাও অফিসের কাজ • সৌরভ চক্রবর্তী ৪
বিজ্ঞান : যেখানে যা হচ্ছে • ভাস্কর ৬
কান্না থামাতে আমাকে দেখানো হয়েছিল ... • শর্মিলা ঠাকুর ৭
আনন্দমেলা-স্ট্যাম্প-ক্লাব ৮
আজও আমার প্রিয় জিম করবেটের বই • সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ৯
ঘাসেরও আছে আভিজাত্য • সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় ১০
মাস্টারমশাই বলেছিলেন ... • বিমল বসু ১২
ছোট হলেও খুবই কাজের রকেট ... প্রদীপচন্দ্র বসু ১৬
দেখে মনে হয় আঁকিবুকি ... • জলধর মল্লিক ১৮
মহেন্দ্রলালের জন্যই গবেষণা করতে পেরেছিলেন সি ভি রামন • বারিদবরণ ঘোষ ১৯
ড্রাকুলার সন্ধানে অর্জুন • সমরেশ মজুমদার ২০
চিঠি • সিদ্ধেশ ২৩
আমবাগানের রাস্তায় • গৌর মিত্র ২৬
জীবিকার নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে ... • অসিতকুমার চৌধুরী ২৯
ধাঁধালি • অমল ভৌমিক ৩৯
খাদিম-এর হজবরল ৫৫
কুইজ ৫৬
সবুজ পাতা • জয়ন্ত বসু
ফার্স্ট হয়েও বাদ পড়ে ঘুরে দাঁড়ালেন জয়নার • সম্রাট রায় ৬২
ফুলব্যাক • মানস চক্রবর্তী ৬৩
খেলার খবর • দর্শক ৬৬
নিয়মিত কমিক্‌স : ৫১, ৫২, ৫৪, ৫৮

প্রচ্ছদের ফোটো : কলম্বিয়া ট্রাইস্টার পিকচার্স-এর সৌজন্যে

সম্পাদক
দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

এবিপি লিঃ-এর পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দাম ১০ টাকা। বিমান মাশুল ত্রিপুরা ২০ পয়সা, কাঠমাণ্ডু, পোর্টব্লেয়ার, শিলচর, ইম্ফল, গ্যাংটক ৩০ পয়সা।

বাড়িতে বসেই ইন্টারনেটে করে 'টেলিকমিউটিং'

ছবি : দেবাশিস দেব

নাও অফিসের কাজ

'টেলিকমিউটিং' বলে নতুন একটা কথা চালু হয়েছে ইন্টারনেট-দুনিয়ায়। এ এমন এক ব্যাপার, যার সাহায্যে বাড়িতে বসে কাজ করে ই-মেলে পাঠিয়ে দেওয়া যায় অফিসে। জানিয়েছেন সৌরভ চক্রবর্তী

গরমে ঘেমে প্রায় স্নান করে ফিরল বনিদাদা। একে গত কয়েকদিন ধরে অফিসে প্রচন্ড ব্যস্ততা যাচ্ছে, তার ওপরে আবার এই গরম, বনিদাদার মতো আরামপ্রিয় ছেলের কাছে এর চেয়ে খারাপ বোধ হয় আর কিছু হতে পারে না। "না, এবার ভাবছি অফিস যাওয়া ছেড়ে দিতে হবে। এই গরমে আর পারছি না।" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুবুলের দিকে তাকিয়ে কথাটা বলল বনিদাদা। বুবুল তো শুনে অবাক, বলে কী বনিদাদা! সবে কয়েক মাস হল নতুন কোম্পানি খুলেছে বনিদাদা, এর মধ্যেই যদি উৎসাহ হারিয়ে ফেলে, তা হলে তো মুশকিল।

বুবুল এইসব ভাবছে, ঠিক তখনই এল বনিদাদার দ্বিতীয় উক্তি, "আবার ভাবছি, বাড়িতে বসেই অফিসের কাজ করব। কয়েকটা যন্ত্র কিনে বসিয়ে নিলেই আমার বাড়িটা হয়ে যাবে, যাকে বলে 'স্মল অফিস হোম অফিস' সংক্ষেপে 'সোহো'।"

এমন একটা জায়গায় এসে বনিদাদা থামল যে-পর্যন্ত বললে জিনিসটা বোঝা যায় না, কিন্তু জানার ইচ্ছেটা সাঙ্ঘাতিক বেড়ে যায়। স্বাভাবিকভাবেই বুবুল প্রশ্ন করল, "একটু ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবে বনিদাদা?"

ঠিক এমনটাই চাইছিল ওদের ইন্টারনেটের গুরু। "দাঁড়া, আমি স্নান করে এসে বুঝিয়ে বলছি তোকে। ততক্ষণে যা তো, দৌড়ে গিয়ে কয়েকটা চপ আর একটা কোল্ড ড্রিঙ্কের বড় বোতল নিয়ে আয়। এই নে, টাকা নিয়ে যা।"

জামাকাপড় বদলে স্নান করে একদম ফ্রেশ হয়ে বনিদাদা বসল বুবুলকে বোঝাতে। "দ্যাখ, অফিসে আমরা কেন যাই? কাজ করতে, তাই তো? এখন সেই কাজটা যদি আমি বাড়ি থেকে করে দিতে পারি, তাতে তো কারও কোনও আপত্তি থাকা উচিত না, ঠিক?"

"হ্যাঁ, কিন্তু বনিদাদা, তোমাকে তো কাজটা করে অফিসে দিতে যেতেই হবে, তাই না? না হলে তো তোমার করা কাজটা বাড়িতেই পড়ে থাকবে।" বুবুলের প্রশ্ন।

"ঠিক ধরেছিস বুবুল। সেইজন্যই তো ইন্টারনেট আসার আগে এসব কেউ ভাবতেও পারত না। যতই বাড়িতে কাজ করো না কেন, জিনিসটা দিয়ে আসতে তো অফিসে যেতেই হবে। কিন্তু এখন আর তেমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই, কাজটা ই-মেলে পাঠিয়ে দিলেই হবে। কাজেই অফিসে যাওয়ার কোনও দরকারই নেই।"

"কিছু মনে কোরো না বনিদাদা, কিন্তু এরকম একটা ব্যাপার কি সত্যিই সম্ভব? খাতায় কলমে তো এগুলো সবই হয়। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে কি এটা হতে পারে?" সন্দিহান গলায় বুবুলের প্রশ্ন।

"হতে পারে কী রে, বিদেশে তো এই ব্যাপারটা পুরোপুরি চালু হয়ে গেছে। এটার একটা সুন্দর নামও দিয়েছে ওরা, 'টেলিকমিউটিং'। আমাদের দেশেও অনেকে এই ধরনের কাজ করছে। মুম্বই আর বাঙ্গালোরে তো অনেক মানুষ পাবি, যারা মার্কিন সংস্থার হয়ে কাজ করছে ভারতবর্ষে বসে। কোম্পানিগুলো তাদের কাজ দরকারমতো ই-মেলে পাঠিয়ে দেয়। আর এখানকার টেলিকমিউটাররা আবার ই-মেল করে পাঠিয়ে দেয়। বুঝলি? শুধু এই নয়, ধর তোর কোম্পানির প্রধান দফতর নিউ ইয়র্কে। সেখানে একটা খুব জরুরি মিটিং হচ্ছে। আগে হলে তোকে এখান থেকে আমেরিকা যেতে হত, কিন্তু এখন ভিডিও কনফারেন্স করে তুই এখানে বসেই কাজ করে নিতে পারবি। তা ছাড়া ইন্টারনেটের মাধ্যমে চ্যাট করার সুবিধে তো রয়েছেই। মোদ্দা কথা, অফিসে গিয়ে কাজ করার দিন শেষ হয়ে আসছে।" বলে থামল বনিদাদা।

"কিন্তু এতে তোমার সুবিধেটা কোথায়?" আবার বুবুলের প্রশ্ন।

"দুর বোকা, এটাও বুঝলি না। আমি সেরকম এখন একটা ওয়েবসাইট তৈরির কাজ করছি। আমি পুরোটা বাড়ি থেকে করে অফিসে... ই-মেল করে দেব। ওখানে ওরা ওটাকে ডাউনলোড করে নেবে। সোজা কথা, বাড়িতে একটা কম্পিউটার আর ইন্টারনেট কানেকশন থাকলে অফিস যাওয়ার আর দরকার নেই। দাঁড়া না, আর কয়েকটা মাস যেতে দে, একবার ইন্টারনেটের ব্যান্ড উইড্থ-এর সমস্যাটা মিটতে দে, তখন দেখবি আরও বেশি করে টেলিকমিউটিং শুরু হয়ে যাবে। এখনই যদি WWW. TJOBS. COM-এ যাস, দেখবি এরকম কাজ কত পাওয়া যায়। নইলে একটা সার্চ দিয়ে দ্যাখ, WWW. AJ. COM-এ প্রচুর ওয়েবসাইট পেয়ে যাবি।"

ইন্টারনেটে সাইকেল দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া যায় একেবারে সত্যিকারের সাইকেল নিয়েই। আজগুবি মনে হচ্ছে? 'সাইকেল-এফ এক্স' নামে এমন একটি 'ইন্টার অ্যাকটিভ' অর্থাৎ দর্শকসংযোজী সফ্টওয়্যার বেরিয়েছে যার সাহায্যে এটা করা যায়। এজন্য অবশ্য একটি বিশেষ ধরনের সাইকেলও দরকার। এই সাইকেল এক জায়গায় একটা ফ্রেমের ওপর বসানো থাকে। সিটে বসে প্যাডেল চালালে চাকা ঘোরে, কিন্তু গড়িয়ে চলে না। বিশেষ-বিশেষ ব্যায়ামের জন্য এ-ধরনের সাইকেল ব্যবহৃত হয়। 'সাইকেল-এফ এক্স' ব্যবস্থায় যে- কেউ সিটে বসে প্যাডেল ঘোরাতে থাকলে, তা কম্পিউটারের পরদায় ইন্টারনেটের মাধ্যমে আসা সাইকেল-দৌড়ের দৃশ্যের অঙ্গীভূত হয়ে যাবে এবং বাস্তবের আরোহীর মনে হবে সেও ওই দৌড়ে একজন প্রতিযোগী। ব্যায়ামের জন্যও ব্যবহার করা যাবে এই ব্যবস্থা। দাম ১৬০ ডলার।

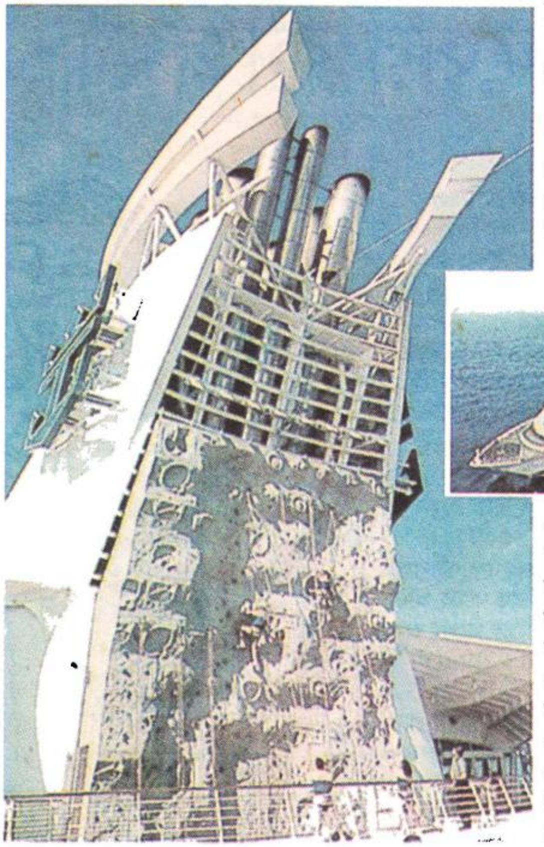

বৃহত্তম প্রমোদতরণী

লম্বায় ১০২০ ফুট অর্থাৎ প্রায় এক মাইলের একের চার ভাগ। আকারে আয়তনে চার-চারটে বোয়িং-৭৪৭ বিমানের চেয়েও বড়। এটি হল

এক জলযান। বিশ্বের বৃহত্তম 'ক্রুইজ শিপ'। নাম 'ভয়েজার অব দ্য সিজ'। এই প্রমোদতরীতে আছে অন্যান্য নানা উপকরণের সঙ্গেই আইস স্কেটিং রিঙ্ক। এমনকী, পাহাড়ে চড়ার অভিজ্ঞতাও মিলবে যাত্রীদের। এজন্য আছে চারতলা সমান উঁচু একটি খাড়া দেওয়াল। প্রতি রবিবার মিয়ামি থেকে এটি রওনা হয় ক্যারিবিয়ান সাগরের উদ্দেশে।

তারামণ্ডলে কল্পবাস্তব

প্ল্যানেটারিয়াম বা তারামণ্ডলে বসেও মহাকাশ-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বা মহাবিশ্ব দর্শনের বিস্ময় তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করা সম্ভব। তবে তার জন্য যেতে হবে নিউ ইয়র্ক। ওই শহরে গড়ে উঠেছে এমন এক নতুন তারামণ্ডল, যেখানে কল্পবাস্তব প্রদর্শনের অঢেল ব্যবস্থা। 'আমেরিকান মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রি'-র অধীন নতুন 'হেভেন প্ল্যানেটারিয়াম'-এ বসানো হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী কল্পবাস্তব সৃষ্টিকারী কম্পিউটার ব্যবস্থা। এর স্পেস থিয়েটারের গঠন সৌরমণ্ডলের অনুরূপ। নতুন তারামণ্ডলের সংশ্লিষ্ট 'হল অব ইউনিভার্স'-এ আধুনিক জ্যোতির্পদার্থবিদ্যার বহুবিধ আবিষ্কারের কল্পবাস্তব চিত্রণও দেখা যাবে, যার মধ্যে আছে মহাবিশ্ব সৃষ্টি ও তার বিবর্তন।

পাললাগানো নৌকোয় মসৃণ ভেসে চলা। হঠাৎ গতি দ্রুত হলে উলটে যাওয়ার ভয় নেই। 'এস্কেপ' সংস্থার নতুন 'সেলবোট' সেভাবেই তৈরি। ত্রিভুজাকৃতির এই নৌকোয় বসার আসন অনেকটা গামলার মতো। যেখানে বসে অপটুরাও স্বচ্ছন্দে নৌকোটি চালাতে পারবেন। একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ বা মহিলা এবং দুটি শিশুর বসবার ব্যবস্থা রয়েছে। নৌকো এদিক-ওদিক ঘোরানোর জন্য স্টিয়ারিং ব্যবস্থাও বেশ সহজ। নৌকো চালাতে শেখা বা নিছক মজার জন্য ভেসে বেড়ানোর পক্ষে এটি একেবারে আদর্শ বলে সংস্থাটির দাবি। দাম ৭০০ ডলার।

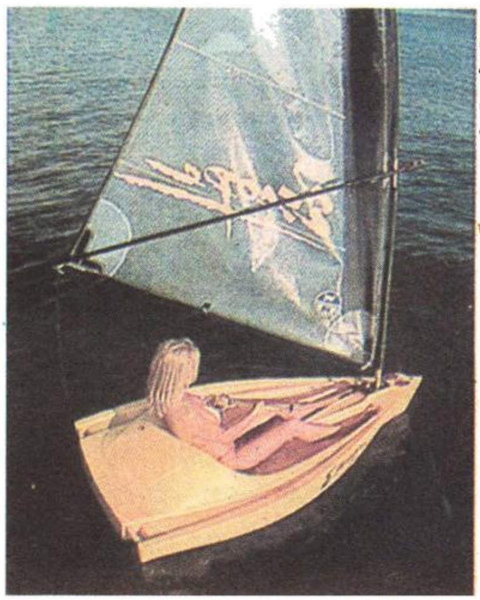

ভাস্কর

ফোটো : অরুণেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শর্মিলা ঠাকুর

একটা কবিতা পড়ে আমার এত ভাল লেগেছিল যে, আমি সেটা খাতায় টুকে নিজের লেখা বলে চালাতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছিলাম। কারণ তখন আমার জানা ছিল না যে, সেটা ছিল রবীন্দ্রনাথের একটা বিখ্যাত কবিতা।

আমার ছেলেবেলার যেসব ঘটনার কথা ভেবে আজকে আমি মজা পাই, সেই সব ঘটনা কিন্তু তখন আমার কাছে খুব দুঃখের ছিল। 'আনন্দমেলা'-র বন্ধুদের কাছে সেই ঘটনাগুলো কতটা মজার হবে সেটা তাই আমার পক্ষে আন্দাজ করা মুশকিল।

আমরা তিন বোন—রিঙ্কু, টিঙ্কু আর চিঙ্কি। টিঙ্কুর সঙ্গে আমার বয়সের তফাত সাড়ে ছ' বছরের আর চিঙ্কি আমার চেয়ে আঠারো বছরের ছোট। চিঙ্কির কথা ছেড়েই দিলাম, এমনকী, টিঙ্কুর সঙ্গেও আমার যা বয়সের তফাত তাতে ওর জন্মের পরে ওর ওপর আমার হিংসেটাই হওয়ার কথা নয়। পিঠোপিঠি ভাইবোনের যে হিংসেটা হয়, সাড়ে ছ' বছরের বড় হওয়া সত্ত্বেও সেই হিংসেটাই ওর ওপর আমার হয়েছিল। টিঙ্কুর জন্মের আগে বাড়িতে আমিই ছিলাম সকলের চোখের মণি। ও এসে আমার সেই ভালবাসায় ভাগ বসাল। আমি তখন লুকিয়ে লুকিয়ে ওকে চিমটি কাটতাম। চিমটি খেয়ে ও যখন কাঁদত, সেখানে কেউ এসে পড়ার আগেই আমি পালিয়ে যেতাম। তাই কেউ বুঝতে পারত না কেন ও কাঁদছে। ও যতদিন না বলতে শিখেছে যে 'দিদি আমায় চিমটি কেটেছে' ততদিন ও আমার চিমটি খেয়েছে।

আমাদের মধ্যে টিঙ্কুই প্রথম ছবিতে অভিনয় করে, তপন সিংহের 'কাবুলিওয়ালা'য়। ওর তখন মাত্র পাঁচ বছর বয়স। শুটিংয়ের সময় ও খুব দুষ্টুমি করত। ওই ছবিতে ছবি বিশ্বাসের মেক আপ করতে অনেক সময় লাগত। টিঙ্কু কোনওদিন ওঁর দাড়ি খুলে দিত, কোনওদিন পাগড়ি খুলে দিত। একদিন বায়না ধরল, "আমার এক্ষুনি চকোলেট চাই, নয়তো আমি নাচব না।" একদিন বলল, "আমার দাঁতে লিপস্টিক লাগাতে হবে, নয়তো আমি হাসব না।" ওর এইরকম নানা দুষ্টুমিতে তপনদারা নাজেহাল হয়ে যেতেন। ওর পরে আমি সিনেমায় অভিনয় করেছি, তখন আমার তেরো বছর বয়স।

ছেলেবেলায় আমাদের সিনেমা দেখার অনুমতি ছিল না। ছোটদের পক্ষে সিনেমা দেখাটা তখন খুবই দোষের ছিল। পুজো, ভাইফোঁটা— এইরকম কোনও উৎসবের সময় আমাদের সিনেমা দেখতে নিয়ে যাওয়া হত। তাও হাতে-গোনা কয়েকটা ছবি দেখেছিলাম, যেমন—'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'কাবুলিওয়ালা', 'ঝনক ঝনক পায়েল বাজে', 'মহল', 'গোপাল ভাঁড়', 'সাড়ে চুয়াত্তর'। সাড়ে চুয়াত্তর দেখারও একটা ইতিহাস আছে। আমার তখন ন'-দশ বছর বয়স। সেই সময় খুব বড় চুল ছিল আমার। কোনও কারণে আমার সেই শখের চুল খুব ছোট করে কেটে দেওয়া হয়েছিল। চুলের শোকে আমি অসম্ভব কেঁদেছিলাম। তখন সান্ত্বনা দিতে, বা বলা ভাল শান্ত করতে আমাকে ওই 'সাড়ে চুয়াত্তর' ছবিটা দেখানো হয়েছিল।

বই পড়ায় আমাদের কোনও বাধা ছিল না। ছেলেবেলায় ছোটদের বই-ই বরং আমি কম পড়েছি— ওই ঠাকুরমার ঝুলি, হ-য-ব-র-ল, আবোলতাবোল এইরকম কয়েকটা। আমি বেশি পড়তাম বড়দের বই। বারো-তেরো বছর বয়সের মধ্যে আমি শরৎচন্দ্র পড়েছি, রবীন্দ্রনাথ পড়েছি। সব লেখা না হলেও বেশ কিছু পড়েছি। কার লেখা না জেনে পড়ে এক মজা হয়েছিল। ক্লাস থ্রি-তে পড়বার সময় লেখা চুরির অপরাধে আমি একবার ধরা পড়েছিলাম। হতে পারে ভালর প্রতি আকর্ষণের ফলে এটা হয়েছিল। একটা কবিতা পড়ে আমার এত ভাল লেগেছিল যে, আমি সেটা খাতায় টুকে নিজের লেখা বলে চালাতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছিলাম। কারণ তখন আমার জানা ছিল না যে, সেটা ছিল রবীন্দ্রনাথের একটা বিখ্যাত কবিতা।

অনুলিখন : অরুণেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

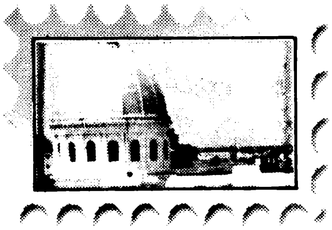

নতুন সহস্রাব্দের প্রথম 'ডেফিনিটিভ সিরিজ'

খামের ওপর ভারতের নির্দিষ্ট গুটিকয় স্ট্যাম্প দেখে অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগে হরেকরকম রংবেরঙের ডাকটিকিট ছাপতে অসুবিধে কোথায়? তাঁদের জন্য সুখবর। নয়া সিরিজের ডাকটিকিট নিয়ে লিখছেন অশোক সেনগুপ্ত।

শুরু হচ্ছে লেপার্ড বেড়াল এবং সুন্দরবনের বায়োস্ফিয়ার সংরক্ষিত অঞ্চলের বাঘকে দিয়ে। মানে, ওদের নিয়েই প্রকাশিত হচ্ছে 'ডেফিনিটিভ সিরিজের' প্রথম দু'টি স্ট্যাম্প।

পাঠকদের অনেকেই জানেন, যে-কোনও দেশে বিশেষ কোনও ঘটনা স্মরণে প্রকাশিত হয় নির্দিষ্ট কোনও 'কমেমোরেটিভ' অথবা 'স্পেশ্যাল' ডাকটিকিট। উপলক্ষ হতে পারে অনেক কিছুই— কোনও নামী ব্যক্তি, ঐতিহ্যপূর্ণ ভবন, কোনও প্রতিষ্ঠানের শতবর্ষপূর্তি প্রভৃতি। এগুলি ছাপা হয় গুটিকয়। সাধারণ লোকের অনেকেই এইসব ডাকটিকিট চোখে দেখারও সুযোগ পান না। কিন্তু 'ডেফিনিটিভ স্ট্যাম্প' ছাপা হয় অনেক।

আমাদের দেশে প্রথম ডেফিনিটিভ সিরিজের ডাকটিকিট প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালে। সেই পর্যায়ের ডাকটিকিটে ছাপা ছবির মূল বিষয় ছিল ভারতের পুরাতাত্ত্বিক সৌধ। এর পরে দেশীয় ঐতিহ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রভৃতি নিয়েও প্রকাশিত হয় ডেফিনিটিভ সিরিজের ডাকটিকিট। এখন যে পর্যায়ের ডেফিনিটিভ সিরিজের ডাকটিকিট বাজারে রয়েছে সেগুলোর বিষয় সামাজিক উন্নয়ন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। এবার প্রকাশিত হতে চলেছে ভারতের অষ্টম ডেফিনিটিভ স্ট্যাম্পের সিরিজ।

নতুন সহস্রাব্দের এই সিরিজ প্রকাশের লক্ষ্য হল দেশের প্রাকৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা ও সেগুলোর সংরক্ষণ। লেপার্ড বেড়ালের স্ট্যাম্পটির দাম হবে ৫ টাকা। আকারে সাধারণ বেড়ালের মতোই, দেখতে যেন মিনিয়েচার প্যান্থার। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত বিভিন্ন বনাঞ্চলে তিন ধরনের লেপার্ড বেড়াল রয়েছে। সুন্দরবনের বায়োস্ফিয়ারের বাঘের ছবিওয়ালা স্ট্যাম্পটি হবে ১০ টাকার। 'ইউনেস্কো'-র বিশেষ প্রকল্প অনুসারে বায়োস্ফিয়ার তৈরির জন্য ভারতের প্রকৃতিকে ১৪ ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

উল্লিখিত বেড়াল ও বাঘ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে অষ্টম ডেফিনিটিভ সিরিজের যেসব স্ট্যাম্প প্রকাশিত হবে, সেগুলোর মধ্যে থাকবে 'ব্ল্যাক বাক', 'নীলগিরি টার', 'সারস ক্রেন', 'কুরিঞ্জি ফ্লাওয়ার', 'স্মুদ ইন্ডিয়ান ওটার', 'টনি কোস্টার বাটারফ্লাই', 'আমলটাস', 'প্যারাডাইস ফ্লাই ক্যাচার'। এগুলোর দাম হবে যথাক্রমে ২৫ পয়সা, ৫০ পয়সা, ১ টাকা, ২ টাকা, ৩ টাকা, ১৫ টাকা, ২০ টাকা ও ৫০ টাকা।

২২ মার্চ সংখ্যার পি ডি অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের নাম :

সায়ন্তন গায়েন, কলকাতা ৪০; **বাসব বাগচী**, কলকাতা ৩৫; **অরিজিৎ খান**, কলকাতা ৪; **অংশুমান সেনগুপ্ত**, কলকাতা ৮৯, **ঈপ্সিতা দাশগুপ্ত**, কলকাতা ৯৩; **শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়**, কলকাতা ৩২; **বিনোদ শ্রীমল**, কলকাতা ২৬; **মণীন্দ্রনাথ সাধুখাঁ**, হাওড়া ৬; **পলক ঘর**, বাঁকুড়া; **সজল সাহা**, কলকাতা ৭৯; **অরুণকুমার বকসি**, কলকাতা ৭৩; **সুকান্ত মিশ্র**, উত্তর ২৪ পরগনা; **সমীরকুমার শর্মা**, উত্তর ২৪ পরগনা; **দেবনাথ পাল**, জলপাইগুড়ি; **অরিত্র লস্কর**, কলকাতা ৮৪।

আজও আমার প্রিয় জিম করবেটের শিকারের বই

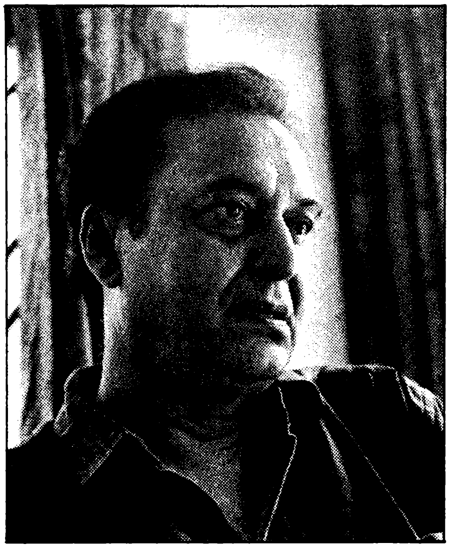

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

ছেলেবেলায় আমি অসম্ভব দুরন্ত ছিলাম। কিন্তু সেই দুরন্তপনা শান্ত করার এক মহৌষধ আমার অভিভাবকরা খুঁজে পেয়েছিলেন। সেটা হল বই। যে-কোনও একটা বই আমার হাতে ধরিয়ে দিলে আমি একেবারে শান্ত হয়ে যেতাম। কারণ, খুব ছেলেবেলা থেকেই বইয়ের প্রতি একটা অসম্ভব টান আমি অনুভব করতাম। আমার বাবা-মা ও ঠাকুরদাদার সংগ্রহে যেমন প্রচুর বই ছিল, তেমনই কলকাতার আরও দুটো বাড়িতে ছিল বইয়ের মেলা। সে দুটো বাড়ির একটা হল আমার বড় পিসিমার বাড়ি। পিসেমশাইয়ের বাবা ছিলেন সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর বিশাল লাইব্রেরি আমায় টানত। আর দ্বিতীয় বাড়িটা হল মায়ের মেসোমশাই সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি। ওই অসংখ্য বই ছিল এই দুটো বাড়ির প্রতি আমার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। যখন বই পড়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না তখনও কোনও বই হাতে পেলে তার পাতা উলটে ছবি দেখতাম। প্রথম যে বইয়ের স্মৃতি আমার মনে আছে সেটা যে বই তা আমি জানতাম না। তার কবিতাগুলোর বেশ কিছু মা আমাদের মুখস্থ বলতেন, কিছু কিছু পড়ে শোনাতেন। পরে জেনেছি সেই বইটি ছিল রবীন্দ্রনাথের 'শিশু'। তার মধ্যে 'বাবা যদি রামের মতো পাঠায় আমায় বনে' বা 'সোম মঙ্গল বুধ এরা সব আসে তাড়াতাড়ি, তাদের ঘরে আছে বুঝি মস্ত হাওয়াগাড়ি' ইত্যাদি কবিতাগুলো আমার শিশুমনকে স্বাভাবিকভাবেই ভীষণ নাড়া দিতে। বড় হয়ে বুঝেছি ওইসব কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নিজের শৈশবস্মৃতি এবং বাবা-মায়ের সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব প্রচ্ছন্নভাবে লুকিয়ে আছে।

একটু বড় হয়ে যখন পড়তে শিখলাম তখন দুটো বই আমার খুব প্রিয় ছিল। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'ছোটদের রামায়ণ' আর 'ছোটদের মহাভারত'। এই দুটি বই থেকেই রামায়ণ-মহাভারতের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। আজও যখন মাঝে-মাঝে কালীপ্রসন্ন সিংহ বা রাজশেখর বসু পড়ি, তখনও ছেলেবেলার ওই দুটি বইয়ের ভাললাগা থেকে মুক্ত হতে পারি না। উপেন্দ্রকিশোরের আর-একটি বই থেকে মা-দিদিমা আমাদের গল্প শোনাতেন, পরে আমরাও পড়েছি, সে বইটি হল 'টুনটুনির বই'। আর-একটা বিখ্যাত বই আমাদের অত্যন্ত প্রিয় ছিল, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি'। বলতে গেলে এই ক'খানা বই আমাদের শৈশবের দিনগুলো অধিকার করে ছিল। তবে আমার কল্পনাকে সবচেয়ে বেশ উজ্জীবিত করেছিল রামনাথ বিশ্বাসের ভ্রমণ কাহিনী। ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস নিজের চেষ্টায় সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। একটা সময় আমি খুব ভাবতাম, আমি ভূপর্যটক হব, সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াব। বইয়ের রাজ্যে ঘুরতে ঘুরতে ক্লাস ফাইভ-সিক্স থেকেই বাংলা সাহিত্যের দরজা আমার কাছে খুলে যায়। 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির' থেকে প্রকাশিত নানা বিখ্যাত সাহিত্যিকের লেখা পড়তে শুরু করি। তার মধ্যে বঙ্কিম গ্রন্থাবলী আমায় ভীষণ টানত। কিন্তু যেগুলো ছোটদের নিয়ে লেখা, যেমন বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' বা 'চাঁদের পাহাড়', সেসব বই আমি আরও পরে পড়েছি। তখন আমি কিশোর। তাই এই বইগুলো আমার মনে বিশাল প্রভাব ফেলেছিল। আর যে বইয়ের কথা এখনই মনে পড়ছে, তা হল ইস্কুলের উঁচু ক্লাসের পাঠ্য বই। তাতে ছিল 'ডেভিড কপারফিল্ড'— আমাকে একেবারে মাতিয়ে দিয়েছিল। আজ পর্যন্ত যত বই পড়েছি সব তো আর মনে নেই। তবে যে বইটি সেই ছেলেবেলা থেকে আজও আমার প্রিয়, তা হল জিম করবেটের বই। এই বইয়ে শিকারের উত্তেজনা তো আছেই, তার চেয়েও বেশি যা আছে তা হল প্রকৃতির অসামান্য বর্ণনা। আর সর্বোপরি এখানে যেসব মানুষের চরিত্র আছে, সেই দরিদ্র ভারতবাসী, যাদের সাহসিকতা, যাদের সরলতা, যাদের আতিথেয়তার পরিচয় জিম করবেটের লেখার মধ্যে ফুটে উঠেছে, তেমনভাবে ওইসব চরিত্রকে পূর্ণতা পেতে আমি খুব কম জায়গাতেই দেখেছি।

অনুলিখন : অরুণেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ঘাস মানেই তুচ্ছতাচ্ছিল্যের বিষয় হোক, তারও আছে আলাদা কদর, আলাদা মর্যাদা। সেই ঘাস আর ফুলে কলকাতা শহরকে নতুনভাবে সবুজ করে তুলছেন এই শহরের এক উদ্যমী কর্মী যুবা গৌতম রায়। এই সবুজায়নের বৃত্তান্ত জানিয়েছেন

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

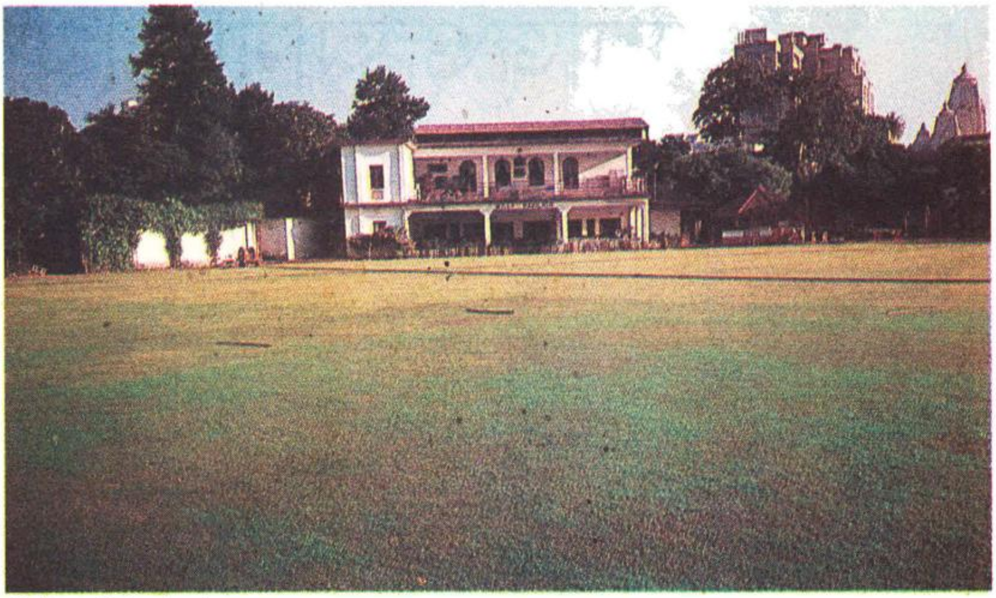

সি সি এফ সি ক্রিকেট মাঠ

ঘাসেরও আছে আভিজাত্য

প্রায় মরুভূমি হয়ে যাওয়া কলকাতা শহর, সবুজ ঘাস আর ফুলে ঢেকে দিচ্ছেন টালিগঞ্জের ছেলে গৌতম রায়। আধুনিক প্রক্রিয়ায় তিন-চার মাসে, অনুর্বর জমিতে ঘাস আর ফুলে ঢেকে দেওয়ার ম্যাজিক এখন গৌতম রায়ের কবজায়। কলকাতার প্রায় ৭০ শতাংশ সবুজ এখন তাঁরই চেষ্টায় সম্ভব হচ্ছে। টালিগঞ্জের গলফ ক্লাব এবং রয়াল ক্যালকাটা গলফ ক্লাব মিলিয়ে মোট ৩৯৫ একর জমিতে 'ফেয়ারওয়ে' এবং 'গ্রিন' তৈরির পুরোটাই তিনি করেন। দিল্লির আই টি সি গলফ মাঠ, শিলংয়ের গজরাজ গলফ ক্লাব, মালয়েশিয়া থেকে নেপালের গলফ কোর্স সবই তাঁর দখলে।

এই মুহূর্তে পিটার টমসন সবুজ ঘাস আর ফুল তৈরির কাজে পৃথিবীতে এক নম্বর। যাঁর এজেন্সিতে কয়েকশো কর্মচারী সরাসরি কাজ করেন। সেই পিটার টমসন চাইছেন, অস্ট্রেলিয়ায় এসে গৌতম রায় তাঁর এজেন্সিতে যোগ দিন। গৌতম অবশ্য বিনয়ের সঙ্গে এই চাকরির প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছেন। শুনলে অবাক হতে হয়, সম্প্রতি হলদিয়া পেট্রোকেম টাউনশিপের সবুজ ঘাস আর ফুলের সার্বিক পরিকল্পনার সরকারি দায়িত্ব পড়েছে গৌতম রায়ের ওপর। কলকাতার ৮০ শতাংশ শিল্পপতি থাকেন আলিপুরে। মিত্তাল, গোয়েন্কা, বাজোরিয়া, বাঙ্গুর থেকে ঝুনঝুনওয়ালাদের ঘর, বারান্দা এবং বাগানের সমস্তটাই গৌতম রায়ের তৈরি করা। সবুজ ঘাস এবং ফুলের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য মিত্তাল, গোয়েন্কারা তাঁকে প্রায় প্রতিমাসেই ফোন করেন। অনেকটা পারিবারিক চিকিৎসকদের মতো। বেশিদিনের কথা নয়, শিল্পপতি মিত্তালের মেয়ের বিয়ে। আমাদের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত আসবেন তাঁর বাড়িতে। আসবেন চলচ্চিত্র জগতের বিখ্যাত নায়ক-নায়িকা শাহরুখ, করিশমা, জুহি, কাজল, সলমন খান। অতিথিরা আগে উঠবেন মিত্তালের বাড়িতে। তাই গৌতম রায়কে ডেকে পাঠিয়েছিলেন এই শিল্পপতি। মাত্র চার মাস সময় দিয়েছিলেন মিত্তাল। তার মধ্যে তাঁর বাড়ির সামনে ফাঁকা জায়গা সবুজে ঢেকে ফেলতে হবে। এমন সাজসজ্জা হওয়া চাই, যাতে অতিথিদের তাক লেগে যায়। ঠিক সাড়ে তিন মাসে গৌতম সাজিয়েছিলেন এই শিল্পপতির বাড়ি। বিখ্যাত অতিথিরা মুগ্ধ। এতটাই মুগ্ধ যে, কলকাতার জাপানি কনসাল জেনারেল তাঁকে ডেকে নিজের এবং জাপানের দূতাবাস সবুজায়নের দায়িত্ব দিয়েছেন। একই ভাবে জার্মান কনসাল জেনারেলও তাঁকে দায়িত্ব দিয়েছেন তাঁর বাড়ি এবং অফিস সাজাবার।

শুনলে মনে হয়, সবুজ ঘাস, এ আর এমন কী, এ তো যেখানে-সেখানে গজায়! গৌতম জানালেন, বিষয়টি মোটেই সহজ নয়, বেশ কঠিন। রাস্তার ঘাস আর গলফ ক্লাব বা গোয়েন্কাদের বাড়িতে সবুজ ঘাসের চরিত্র এক নয়। এইসব ঘাসেরও আছে আভিজাত্য। ঘাসের ওজন বেড়ে বা কমে গেলে বিস্তর অসুবিধে হয়। এই জাতীয় ঘাসের সবসময় এক মাপ থাকা দরকার। তা না হলে গলফ খেলা এবং চলাফেরায় অসুবিধে হয়। সাধে কি মিত্তাল বা জাপানের কনসাল জেনারেল তাঁকে ফোন করেন! ঘাসকে রোগজীবাণু থেকে বাঁচাতে হবে। ঘাসের সবুজ রং নষ্ট হয়ে হলুদ রং হলে চলবে না। ঘাসের পাশে আগাছা থাকা চলবে না। ঘাসকে হতে হবে 'স্লিম ফিগার'-এর নায়ক। গৌতম আরও জানালেন, গলফ কোর্সে বা শিল্পপতিদের বাড়িতে লাগানো হয় বারমুড়া

গৌতম রায়

রয়াল ক্যালকাটা গলফ কোর্সে ঘাস পরীক্ষা করা হচ্ছে

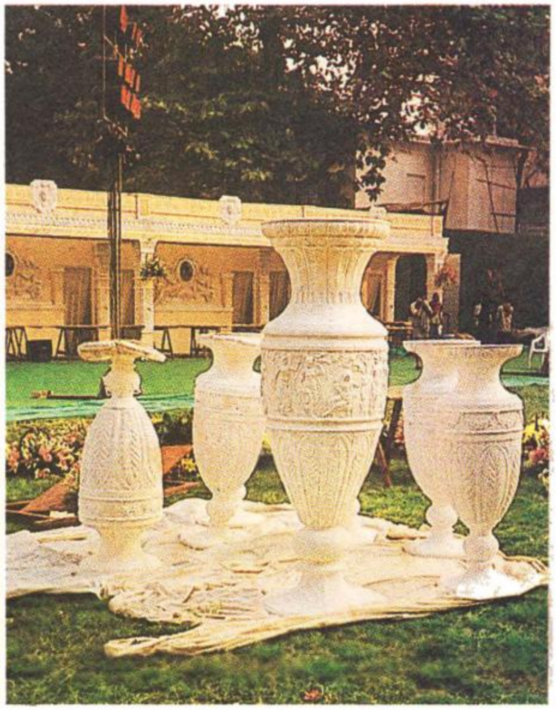

ফুলের জলসায় চলছে বিয়ের অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি

বা মালয়েশিয়া ঘাসের বীজ। কলকাতার আবহাওয়ায় এটা উপযুক্ত।

প্রথমে গৌতম রায় করেন 'ল্যান্ড ডিজাইন'। অর্থাৎ কত একর বা কত বিঘার জমিতে ঘাস ফুল ছাওয়া হবে এবং কীভাবে হবে তার পরিকল্পনা। তারপর 'হেরোয়িং' অর্থাৎ মাটিকে ঝুরো-ঝুরো করা হয়। এর পর 'ফার্টিলাইজার'। অর্থাৎ রাসায়নিক সার, ওষুধ ইত্যাদি প্রয়োগ, তারপর 'প্লান্টিং'। মানে ঘাসের বীজ বপন। এর পর সমস্ত ফাঁকা জায়গা যখন সবুজ ঘাসে ভরে ওঠে তখন চলে ঘাসের 'চেক আপ'। অর্থাৎ সপ্তাহে সপ্তাহে ঘাস ছাঁটা। রোজ জল দেওয়া। মাসে একবার ওষুধ। এর বাইরেও আছে আধুনিকীকরণের নানা প্রক্রিয়া। গৌতম অবশ্য তা বলতে নারাজ তাঁর ব্যবসায়িক 'সিক্রেট'-এর জন্য। তবে ঘাসের নিয়মিত স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আনান পৃথিবীর সবচেয়ে আধুনিকতম যন্ত্রপাতি। ফোর্ট উইলিয়ামের মাঠের দায়িত্ব বাইরের কাউকে দেওয়া হয় না। সরকারি বিধিনিষেধ আছে। তবু ঘাসের রোগ-ব্যাধি হলে সেই গৌতম রায়ের সঙ্গেই তাঁরা আলাপ-আলোচনা করেন বলে শোনা যায়।

চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই গৌতম এই কাজ শিখলেন কী করে? গৌতম জানান, রয়াল ক্যালকাটা গলফ ক্লাবের পেরেরা তাঁকে প্রথমে মাঠের সবুজায়নের কিছু কাজ দেন। সেই সময় এই গল্‌ফ কোর্সের দেখাশোনা করতেন অস্ট্রেলিয়ার ফিল্ড রায়ন। তিনিই গৌতমকে হাতে-কলমে কাজ শেখান। পরে ফিল্ড রায়ন অস্ট্রেলিয়ায় চলে গেলে পুরো দায়িত্বটাই পান গৌতম এবং ধীরে ধীরে কলকাতার সবুজ ঘাস তৈরির কাজে তিনি অপরিহার্য হয়ে ওঠেন। এখনও গৌতম ফোনে ফিল্ড রায়নের কাছ থেকে টিপ্‌স নেন। পিটার টমসনের মতো ফিল্ড রায়নও চান গৌতম তাঁর এজেন্সিতে যোগদান করুন। কলকাতার মেট্রো স্টেশনগুলোর মাটির ওপর সাজানো ঘাস, ফুলের সব সৌন্দর্যই দক্ষিণ কলকাতার এই মানুষটির হাতে তৈরি। গৌতমের কথা, ঘাস, ফুলে অক্সিজেন তৈরি হয়। সুতরাং কলকাতার মানুষকে, বলতে পারেন, আমি বহুমূল্য অক্সিজেন জোগাই। ঘাস, ফুল মরে গেলে ঠিকমতো অক্সিজেন পাওয়া যায় না। আমি সেই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অক্সিজেন তৈরি করে চলেছি।

গৌতম রায়ের এই কাজের পেশাগত নাম 'গল্‌ফ আর্কিটেক্ট অ্যান্ড কন্ট্রাক্টর'। তাঁর আশা, তিনিই একদিন বিশ্বের সেরা হবেন। ছাড়িয়ে যাবেন পিটার টমসনকেও। প্রসঙ্গত সি. সি. এফ. সি. ক্রিকেট-মাঠের পিচ সহ সবুজায়নের সম্পূর্ণ দায়িত্ব পেলেন এই প্রথম এক বাঙালি যুবক, তিনি গৌতম রায়।

গৌতম রায়ের নির্দেশে চলছে ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার হাসপাতালে সবুজায়নের কাজ

ফোটো : গৌতম রায়ের সৌজন্যে

মাস্টারমশাই বলেছিলেন ছেলেটির কিছু হবে না

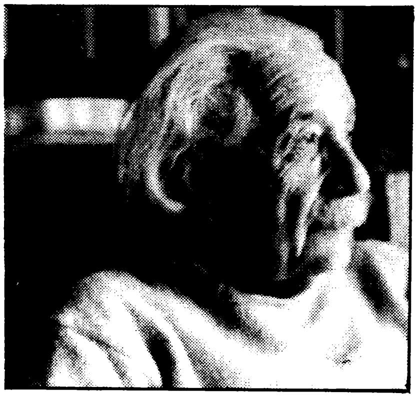

স্কুলের পড়াশোনায় বরাবরই ছিলেন খারাপ। হাই স্কুলের পড়া শেষ করেননি। টেকনিক্যাল স্কুলে ভর্তির পরীক্ষায় প্রথমবার অকৃতকার্য হন। অথচ পরবর্তী জীবনে ইনিই আবিষ্কার করেছিলেন আপেক্ষিকতার তত্ত্ব। অ্যালবার্ট আইনস্টাইনকে নিয়ে লিখেছেন **বিমল বসু**

ছেলেটির বাবা তার স্কুলের প্রধানশিক্ষককে একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, ভবিষ্যতে কোন পেশা ওর বেছে নেওয়া উচিত? শিক্ষক জবাব দিয়েছিলেন একটিমাত্র বাক্যে, "যে পেশাই হোক, তাতে কিছু এসে যায় না, কারণ কোনওটিতেই ও কিছু করতে পারবে না।"

সেই ছেলেই বড় হয়ে এমন কিছু করলেন, যাকে 'মহাবিপ্লব' বললেও ভুল হয় না। বিশ্ব ও জগৎ সম্পর্কে নিউটনের ধ্রুপদী ধারণাটাকেই পালটে দিলেন তিনি। আবিষ্কার করলেন 'থিওরি অব রিলেটিভিটি'—আপেক্ষিকতার তত্ত্ব বা আপেক্ষিকতাবাদ। তিনি বলেন, এই যে চোখের সামনে আমরা বস্তুর গতি ও শক্তি, 'টাইম' ও 'স্পেস' অর্থাৎ সময় ও স্থানকে দেখছি, কোনওটাই 'অ্যাবসলিউট' বা অপরিবর্তনীয় নয়, ধ্রুব নয়, সবই আপেক্ষিক। বস্তুর গতি আর পর্যবেক্ষকের অবস্থানের পরিবর্তনে বদলে যায় সবকিছু। বদলায় না শুধু আলোর গতিবেগ।

'কিছুই হবে না' বলে ঘোষণা করে দেওয়া ছেলেটি কে, এতক্ষণে নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে। মহাবিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। ১৮৭৯ সালের ১৪ মার্চ জার্মানির মফস্বল শহর উল্‌ম-এ এক ইহুদি পরিবারে আইনস্টাইনের জন্ম। বাবা হেরম্যান আইনস্টাইন ছিলেন ছোট ব্যবসায়ী। উলমে ব্যবসা ভাল চলছিল না বলে অ্যালবার্টের জন্মের এক বছর পরেই হেরম্যান মিউনিখে গিয়ে তাঁর ভাই জেকব-এর সঙ্গে নতুন করে ব্যবসা শুরু করেন। অ্যালবার্টের ছেলেবেলাটা কেটেছিল মিউনিখেই। খুব ছোট থেকেই ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন। কথা বলতে শুরু করেন সাধারণ শিশুদের তুলনায় একটু বেশি বয়সে। তিন বছরের ছোট বোন মাজা-র স্মৃতিচারণায় জানা গেছে, ছ'-সাত বছর বয়সে কখনও-কখনও হঠাৎ রেগে যেতেন অ্যালবার্ট। হাতের জিনিস ছুড়ে ফেলে দিতেন। একবার তো রাগের চোটে বাগানের নিড়ানি দিয়ে বোনের মাথায় এক ঘা বসিয়ে দিয়েছিলেন। এরকম দু'-একটি ঘটনা ছাড়া সাধারণভাবে শিশু অ্যালবার্ট স্বভাবে ছিলেন শান্তই।

অ্যালবার্টকে প্রথম স্কুলে পাঠানো হয় পাঁচ বছর বয়সে। ১০ বছর বয়সে ভর্তি হন হাই স্কুল লুটিগোল্ড জিমনাশিয়ামে। স্কুলের ধরাবাঁধা পড়াশোনা তাঁর কোনওদিনই ভাল লাগেনি। ক্যাথলিক স্কুলের অতিরিক্ত কড়াকড়িও তাঁর ভীষণ অপছন্দ ছিল। তাই শেষ বয়সে সেই অভিজ্ঞতা স্মরণ করতে গিয়ে আইনস্টাইন একবার বলেছিলেন, "প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের মনে হত এক-একজন সার্জেন্ট, আর জিমনাশিয়ামের টিচাররা ছিলেন একেবারে মিলিটারি লেফটেন্যান্ট।" আসলে কোনও ব্যাপারেই কর্তৃত্বের বাড়াবাড়ি তিনি সহ্য করতে পারতেন না। বরাবরই স্বাধীনচেতা ছিলেন, এবং সে-গুণ তাঁর পারিবারিক সূত্রেই পাওয়া। মাত্র চার বছর বয়সে মিউনিখের পথেঘাটে ঘুরে বেড়ানোর অবাধ ছাড়পত্র পেয়েছিলেন মায়ের কাছে। আবার ১৫ বছর বয়সে ব্যবসার খাতিরেই মিউনিখের পাট চুকিয়ে বাবা যখন ইতালি চলে গেলেন, তখন হাই স্কুলের পড়া শেষ করার জন্য তাঁকে রেখে যান একটি হস্টেলে। ছেলে যাতে তাড়াতাড়ি স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে সেদিকে বাবা-মা, বিশেষ করে মা পলিনের কড়া নজর ছিল।

স্কুলজীবনে আইনস্টাইনের প্রতিভার কোনও প্রতিফলনই দেখা যায়নি, হয়তো প্রথাগত লেখাপড়ায় তাঁর মন ছিল না বলেই। ছ'বছর বয়সেই মা একরকম জোর করেই তাঁর বেহালা শেখানোর ব্যবস্থা করেন। নেহাত অনিচ্ছার সঙ্গে শুরু করলেও একসময় এই বাজনাটার প্রতি আইনস্টাইন আকৃষ্ট হন। এবং বেহালা তাঁর আজীবনের সঙ্গী হয়ে ওঠে। অনেক পরে যে ভারতীয় বিজ্ঞানীর কাজের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল তাঁর নাম, সেই সত্যেন বসুও ছড়ের টানে সুর তুলতেন এস্রাজে। দুরূহ গভীর বিজ্ঞানচিন্তার অবকাশে তাঁরা আনাগোনা করতেন সুরলোকে। শৈশবে আর-একটি ছোট ঘটনা আইনস্টাইনের জীবনে গভীর ছাপ ফেলেছিল। বছরপাঁচেক বসে তখন। অসুস্থ হয়ে একেবারে শয্যাশায়ী। বাবা এনে দিলেন একটি ছোট চৌম্বক কম্পাস। শিশু অ্যালবার্ট সেটি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে যত দেখে ততই অবাক হয়ে যায়। যন্ত্রটি যে-দিকেই ঘোরানো হোক না কেন, কম্পাসের কাঁটা ঠিক উত্তরমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। হয়তো কোনও অজানা রহস্যময় শক্তিই এর কারণ। অ্যালবার্ট ভাবে, স্কুলের পড়ায় এই মজা নেই কেন? এ-ধরনের প্রশ্নের মধ্যেই হয়তো সুপ্ত ছিল ভবিষ্যতের আপেক্ষিক তত্ত্বচিন্তার বীজ।

কৈশোর থেকেই গণিতের প্রতি তীব্র আকর্ষণ ছিল আইনস্টাইনের। বীজগণিতে তাঁর মনে প্রথম আগ্রহ জাগিয়ে তোলেন কাকা জেকব। মজা করে তিনি বলতেন, "আমরা এমন একটি ছোট্ট জন্তু শিকারে বেরিয়েছি, যার নাম জানা নেই। তাই তার নাম দেওয়া হল X; এবার তাকে ধরো, তারপর ঠিক নামটি দিয়ে দাও।"

বালক আইনস্টাইনের জিজ্ঞাসু মনে বিজ্ঞান বিষয়ে কৌতূহল সৃষ্টির পেছনে ছিল আরও দুটি মানুষের বিশেষ অবদান। একজন হলেন তাঁর নিজের মামা কাসার কখ্, অন্যজন এক ডাক্তারির ছাত্র, নাম ম্যাক্স

তালমুদ। তালমুদ প্রতি বৃহস্পতিবার তাঁদের বাড়িতে সান্ধ্যভোজে যোগ দিতেন। ১২ বছরের অ্যালবার্টকে তিনি একটি জ্যামিতির বই উপহার দিয়েছিলেন। এই বইটি হাতে পাওয়া যে তাঁর বিজ্ঞানী হয়ে ওঠার পথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, সে-কথা পরবর্তীকালে আইনস্টাইন একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। কিশোর অ্যালবার্টের সঙ্গে তালমুদ বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে আলোচনাও করতেন। তালমুদ লিখেছেন, "জ্যামিতির বইটি কয়েক মাসের মধ্যেই অ্যালবার্ট আয়ত্ত করে ফেলেছিল। এর পর উচ্চতর গণিত নিয়েও পড়াশোনা শুরু করে, সেসব বইয়ের হদিস আমিই তাকে দিয়েছিলাম।"

হাই স্কুলের পড়া শেষ না করেই অ্যালবার্ট চলে যান ইতালিতে বাবা-মা'র কাছে। হের্ম্যান চাইছিলেন ছেলে এঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক হয়ে পারিবারিক ব্যবসায় যোগ দিক। তাই অ্যালবার্টকে জুরিখের টেকনিক্যাল স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য পাঠান। কিন্তু প্রথমবার ভর্তির পরীক্ষায় তিনি অকৃতকার্য হন। বিজ্ঞান ও গণিতে ভাল নম্বর পেলেও ভাষা ও ইতিহাসে উতরোতে পারেননি। পরের বার অবশ্য একটি স্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করে সরাসরি ভর্তি হয়ে যান। কিন্তু স্নাতক স্তরেও পাঠক্রমের বাঁধাধরা পড়ায় তাঁর মন ছিল না। নিজের খেয়ালখুশিতে চলতেন। বাইরের ভারী-ভারী বই পড়তেন আর ভাবতেন। তাই পরীক্ষার ফল মোটেই ভাল হল না। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। যা হোক একটা চাকরি চাই। এ সময়েই এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সুপারিশে সুইজারল্যান্ডের বার্ন-এ পেটেন্ট অফিসে আইনস্টাইন একটি চাকরি পান। তাঁর প্রধান কাজ ছিল পেটেন্ট সংক্রান্ত আবেদনগুলি পরীক্ষা করা।

আইনস্টাইন সুইশ পেটেন্ট অফিসে ছিলেন ১৯০২ থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত। চাকরি পাওয়ার পরই তিনি বিয়ে করেন টেকনিক্যাল স্কুলের সহপাঠিনী মাভিয়া ম্যারিককে। বার্নেই সংসার পাতেন। পাশাপাশি কয়েকজন বুদ্ধিজীবী বন্ধু মিলে একটি গোষ্ঠীও গড়ে তোলেন, যেখানে পদার্থবিদ্যার সাম্প্রতিক গবেষণা ও আবিষ্কার নিয়ে গভীর আলোচনা হত। ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ছিলেন মাইকেলেঞ্জেলো বেসো, যিনি মজা করে ওই গোষ্ঠীর নাম দিয়েছিলেন 'ওলিম্পিয়া অ্যাকাডেমি'। এই পর্বেই আইনস্টাইনের বিজ্ঞানভাবনা ও গবেষণা উৎকর্ষের শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছয়। মজার কথা হল, ল্যাবরেটরিতে প্রথাগত গবেষণা তিনি করেননি। তাঁর ল্যাবরেটরি ছিল মস্তিষ্ক. যন্ত্রপাতি বলতে পেন্সিল আর কলম। তাঁর পরীক্ষা ছিল চিন্তার জগতে, যাকে বলা হয় 'হট এক্সপেরিমেন্ট'।

এ-সময়েই পরপর আইনস্টাইনের কয়েকটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে ছিল ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য থিসিস, 'ফোটো ইলেকট্রিক এফেক্ট' অর্থাৎ আলোকতড়িতীয় প্রতিক্রিয়া নিয়ে কাজ এবং 'স্পেশ্যাল থিওরি অব রিলেটিভিটি' বা বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ। জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডক্টরেট পেয়ে যান সহজেই। ফোটো ইলেকট্রিক এফেক্টের ওপর কাজের জন্যই নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন অনেক পরে, ১৯২২ সালে। আর বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ (১৯০৫) বিজ্ঞানীমহলে তাঁকে বিখ্যাত করে দেয় কয়েক বছরের মধ্যেই। এ-সমস্ত গবেষণাপত্রই অতি উচ্চ গণিতের

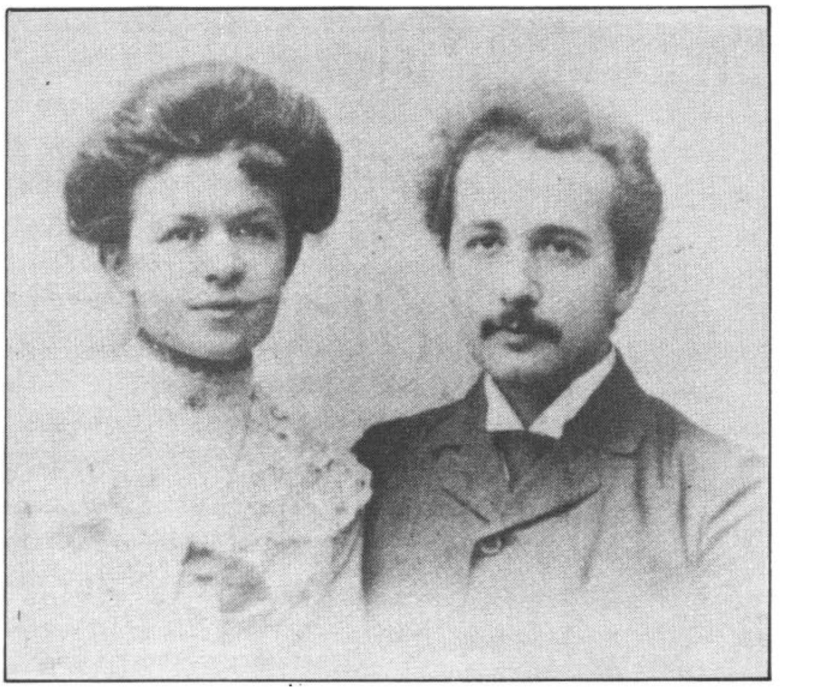

সস্ত্রীক আইনস্টাইন

ভাষায় লেখা, গণিতের বিশেষ জ্ঞান ছাড়া যা বোঝা সম্ভব নয়। তবে বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের মূল কথাটি কঠিন নয়। যার মোদ্দা কথা হল, আলোর গতিবেগই চরম এবং ধ্রুব। আলোর উৎস বা পর্যবেক্ষকের অবস্থান ও গতিবেগ বদলালেও আলোর বেগ একই থাকে। বস্তুর গতিবেগ যত বাড়ে ততই তার দৈর্ঘ্য কমে আর ভর বাড়তে থাকে। কমতে থাকে সময়ের চলন। গতিশীল বস্তুর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া ঘড়ি ক্রমশ 'স্লো' চলবে। অতি বেগবান কোনও মহাকাশযানের যাত্রীরা কয়েক বছর ঘুরে পৃথিবীতে ফিরে এসে দেখবেন তাঁদের আত্মীয়স্বজনরা কেউ আর বেঁচে নেই। অথচ তাঁদের নিজেদের বয়স তেমন কিছুই বাড়েনি। এই তত্ত্বেই আছে বস্তু ও শক্তির সম্পর্ক নির্ণায়ক বিখ্যাত সমীকরণ $E=Mc^2$, যেখানে E হল বস্তুর মধ্যে নিহিত শক্তি, M বস্তুর ভর এবং c আলোর গতিবেগ।

এর পর ১৯১৬ সালে আইনস্টাইনের আর-একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার 'জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটি' বা সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। যেখানে মহাকর্ষের সম্পূর্ণ নতুন সংজ্ঞা দিয়েছেন তিনি। বলেছেন মহাকর্ষ বা অভিকর্ষ হল 'স্পেস-টাইম' অর্থাৎ সময় ও স্থান মিলিয়ে এক বিশেষ ক্ষেত্রের বিকৃতি থেকে উদ্ভূত টান।

পেটেন্ট অফিসের সংকীর্ণ গণ্ডি ছেড়ে বিভিন্ন সময়ে নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে মর্যাদাপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন আইনস্টাইন। মাত্র ৪০ বছর বয়সেই চুল সাদা হয়ে যাওয়া মানুষটি একসময় বিজ্ঞানমনীষী হিসেবে স্বীকৃত হন সারা বিশ্বে। ১৯৫৫ সালে মারা যাওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি বিজ্ঞানভাবনায় সম্পৃক্ত ছিলেন। এতই ছিল তাঁর মগ্নতা যে, কথিত আছে, বাইরে বেরিয়ে কখনও-কখনও বাড়ি ফেরার পথও হারিয়ে ফেলতেন তিনি।

মজার কথা হল, ল্যাবরেটরিতে প্রথাগত গবেষণা তিনি করেননি। তাঁর ল্যাবরেটরি ছিল মস্তিষ্ক, যন্ত্রপাতি বলতে পেন্সিল আর কলম। তাঁর পরীক্ষা ছিল চিন্তার জগতে, যাকে বলা হয় 'হট এক্সপেরিমেন্ট'।

নদীর নাম জিয়াভরলি, গুম্ফার নাম তাওয়াং

ভালুকপং থেকে জিয়াভরলি নদী পেরিয়ে বমডিলা, সেখান থেকে আরও একদিনের পথ তাওয়াং গুম্ফা। সেখানে প্রকৃতি তার সৌন্দর্যের সেরা সম্ভার সাজিয়ে বসে আছে পর্যটকদের জন্য। লিখেছেন উৎপল বিশ্বাস

অনেক বছর ধরে অরুণাচলকে মানুষ চিনত 'হিডেন ল্যান্ড' হিসেবে। তিব্বত, ভুটান আর মায়ানমারের সীমান্তবর্তী এলাকায় এই রাজ্য ছিল মানুষের চোখের আড়ালে। প্রায় ৮৩ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকার অধিকাংশই গভীর বনে ঢাকা, পাহাড়ি পথের দুর্গমতা যেন নাগরিক জীবনকে দু'হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে রেখেছে। তবে পরিস্থিতি পালটানো শুরু হয় ১৯৬২ সালে চিন-ভারত যুদ্ধের পর থেকে। আস্তে-আস্তে বাইরের মানুষের মনে এই অঞ্চলের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়, বাড়তে থাকে পর্যটকদের আনাগোনা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পর্যটকদের আকর্ষণ করতে থাকে অরুণাচল।

তেমনই এক জায়গা তাওয়াং। অরুণাচলের পশ্চিম কামেং জেলার একেবারে উত্তরে তিব্বত সীমান্তের গা ঘেঁষে এই ছোট্ট শহর। অসমের তেজপুর থেকে তাওয়াঙের দূরত্ব ৩১০ কিমি। বাসে দু'দিনের পথ। ভারতীয়দেরও সেখানে পৌঁছতে বিশেষ অনুমতিপত্র জোগাড় করতে হয়। ভালুকপং ছাড়িয়ে কিছুদূর যেতেই পাহাড়ি নদী। নদীর নাম জিয়াভরলি। নামের মানে, যে হৃদয় ভরিয়ে দেয়। এমন আশ্চর্য সার্থকনামা নদী ভারতবর্ষে আর দুটো নেই। নদীর সৌন্দর্য সত্যিই হৃদয় ভরিয়ে দেওয়ার মতো। নদীর ধার ঘেঁষে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বাসরাস্তা। চারপাশে ঝিঁঝি-ঢাকা বন, দূর থেকে কানে আসে নদীর ছলছল। সারা পথ জুড়েই চোখে পড়বে সেনাছাউনি। ক্রমশ রুপা, টেঙ্গা হয়ে বিকেলে বাস পৌঁছবে সদর শহর বমডিলায়।

তেজপুর থেকে তাওয়াং যাওয়ার পথের ঠিক মাঝামাঝি বমডিলা। বমডিলা থেকে দিরাং উপত্যকা দিয়ে বাস ঘুরতে-ঘুরতে উঠবে বিখ্যাত সেলা পাসের দিকে। যাঁরা গাড়ি ভাড়া করে যাবেন, তাঁদের জন্য দিরাং ভ্যালির একটা জায়গার নাম মনে করিয়ে দিতে চাই। 'রামা ক্যাম্প'-এর কাছেই আছে নদীর ধারে একটি সুন্দর গরম জলের কুণ্ড। রামা ক্যাম্প থেকে প্রায় ঘণ্টা দুই পরে সেলা পাসে দুর্গা মন্দিরের কাছে বাস থামবে। উচ্চতা ৪২০০ মিটার।

সেলা থেকে বাস বেশ কিছুটা নেমে যাবে। যশোবন্তগড় (৩০০০ মিটার), জং (২৩৫২ মিটার) হয়ে শেষে তাওয়াং (২৯৪০ মিটার) পৌঁছবে দ্বিতীয় দিন বিকেলের মুখে। তাওয়াঙে ঠাণ্ডা যথেষ্টই। অক্টোবর এবং নভেম্বর মাসই উপযুক্ত পর্যটকদের জন্য। শহরের বেশ কিছুটা অংশে সেনাছাউনি এবং গোয়েন্দা বিভাগের বিভিন্ন দফতর। কাশেং নদী শহরের নীচে দিয়ে বয়ে চলেছে। তার রং নীল। ঢেউ খেলানো পাহাড়ের গায়ে শহরটি যেন বিছিয়ে রেখে গিয়েছে কেউ। মানুষের কোনও ব্যস্ততা নেই,

গুম্ফার প্রাঙ্গণে কয়েকজন লামা

ছবির মতো মনোমুগ্ধকর পাহাড়ি ঝড়না

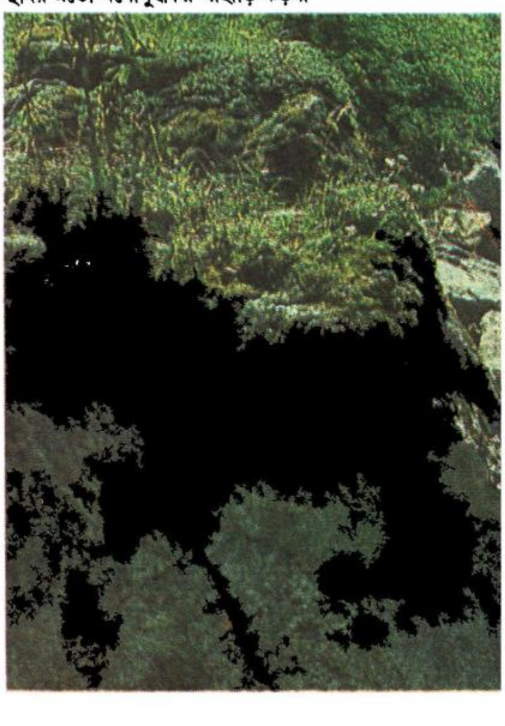

কোলাহল নেই। ঘড়ির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এখানকার দোকানপাট খোলে আর বন্ধ হয়। এখানেও সার্কিট হাউস আছে, আর আছে বেশ কয়েকটা হোটেল। শহরের পথেঘাটে বেশিরভাগই অফিস-গাড়ি। কাজেই হেঁটে ঘোরাই শ্রেয়। কিন্তু বেশিদূর যাওয়া যাবে না। হেঁটে শহর ছাড়িয়ে দূরে যাওয়া নিষিদ্ধ প্রতিরক্ষা-সংক্রান্ত কারণে। শহরের মধ্যে দ্রষ্টব্য বলতে এখানকার বিখ্যাত 'তাওয়াং' গুম্ফা।

শহরের যে-কোনও প্রান্ত থেকেই দেখা যায় এই গুম্ফাটি। একটা পাহাড়ের মাথায়। পাখির বাসার মতো বসে আছে গুম্ফাটি, আয়তনে ১৩৫ বর্গমিটার। প্রধান মন্দিরটি অর্ধবৃত্তাকারে ঘিরে রয়েছে প্রায় ২০০ সাদা রঙের বাড়ি। ঠিক যেন এক দুর্গ। পাহাড়চুড়োর পাড় বসানো নীল আকাশের শামিয়ানার নীচে এই অসাধারণ গুম্ফাটির দিকে তাকিয়ে-তাকিয়েই দিন কেটে যায়। শহর থেকে গুম্ফায় হেঁটে যাওয়ার পথে একটা গুম্ফায় পাহাড়ি ঝরনা পেরোতে হবে। কাচের মতো স্বচ্ছ তার জল। গুম্ফার কাছে যেতে চোখে পড়বে প্রত্যেকটি বাড়ির সংলগ্ন একটা করে প্রার্থনাগৃহ রয়েছে। সমগ্র গুম্ফার আবাসন ঘিরে আছে ৬১০ মিটার লম্বা প্রাচীর। প্রধান উপাসনাকক্ষে ঢোকার আগে টিকিট কাটতে হবে। গলি ধরে সংলগ্ন চত্বরে প্রবেশ করতে হয়। চত্বরের মাঝখানে লম্বা গাছের খুঁটি। তার চারধারে চলছে লামাদের পুজোর আয়োজন। তত্ত্বাবধানে রয়েছেন 'রিন পোচে', অর্থাৎ প্রধান লামা। প্রধান মন্দিরের ভেতরে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে দোতলার বারান্দায় যাওয়ার পথ। সমস্ত জায়গা কাঠের কারুকার্য করা। ১৭ শতকের অসাধারণ শিল্পকর্মের নিদর্শন। ভেতরের দেওয়ালের চারদিকেই ভগবান বুদ্ধের নানা রূপের ছবি আঁকা। মেঝেতে এবং জানলার ধারে-ধারে অসংখ্য প্রদীপ আর ডালা সাজানো। বড় বড় শিঙ্গা আর

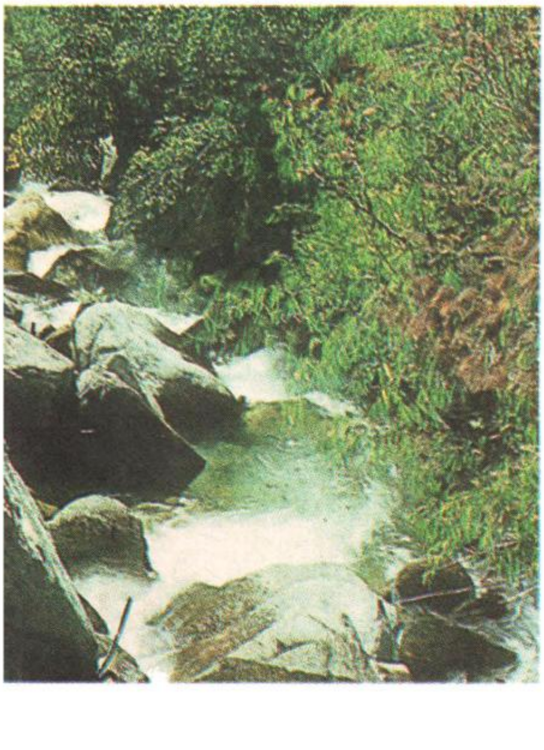

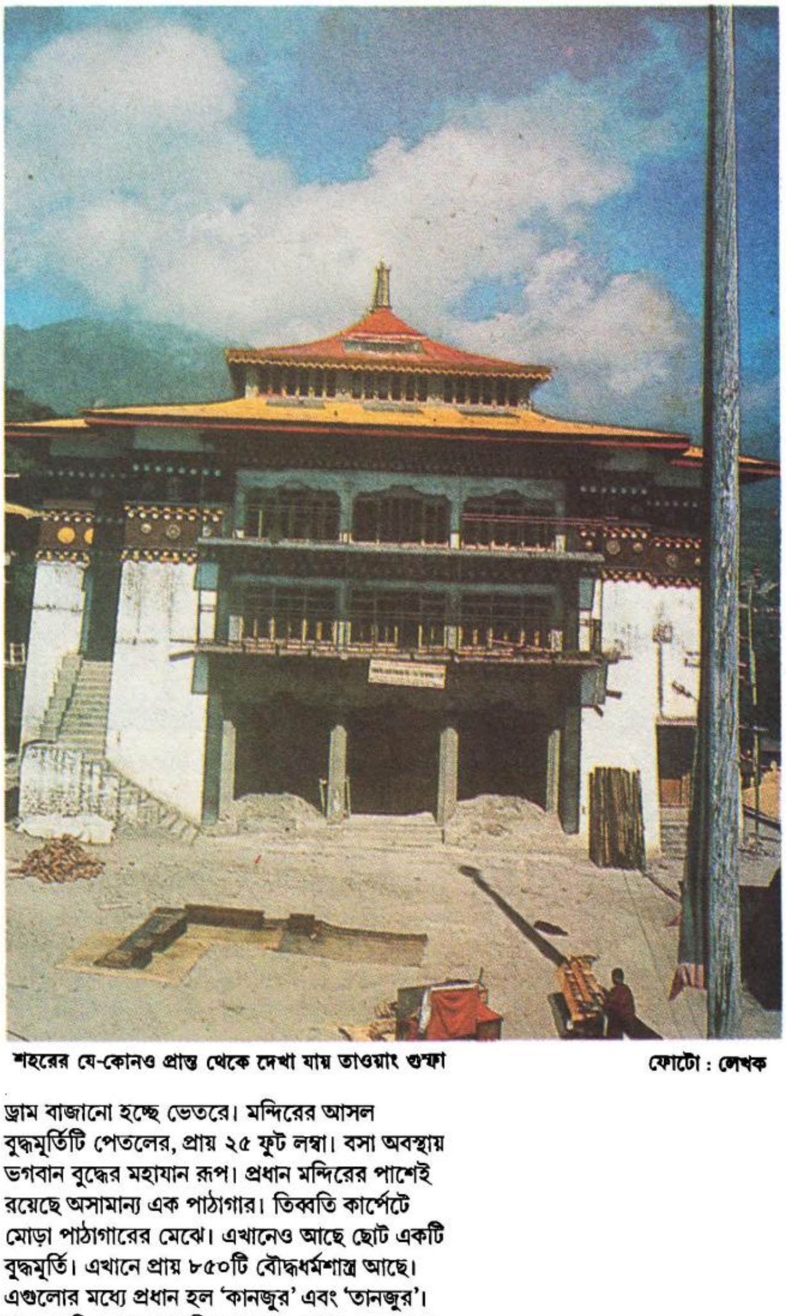

শহরের যে-কোনও প্রান্ত থেকে দেখা যায় তাওয়াং গুম্ফা

ফোটো : লেখক

ড্রাম বাজানো হচ্ছে ভেতরে। মন্দিরের আসল বুদ্ধমূর্তিটি পেতলের, প্রায় ২৫ ফুট লম্বা। বসা অবস্থায় ভগবান বুদ্ধের মহাযান রূপ। প্রধান মন্দিরের পাশেই রয়েছে অসামান্য এক পাঠাগার। তিব্বতি কার্পেটে মোড়া পাঠাগারের মেঝে। এখানেও আছে ছোট একটি বুদ্ধমূর্তি। এখানে প্রায় ৮৫০টি বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র আছে। এগুলোর মধ্যে প্রধান হল 'কানজুর' এবং 'তানজুর'। প্রধান মন্দির থেকে বেরিয়ে যতদূর চোখ চলে, কেবল একের পর এক গলি। গোটা এলাকায় রয়েছে ছোট-বড় ৬৫টি গলি। ছোট-ছোট লামারা খেলছে গলিতে।

তাওয়াঙে আরও একটা গুম্ফা আছে। তার নাম আনি গুম্ফা। 'আনি' মানে হল বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী। এই গুম্ফার ভেতরে যাওয়া পর্যটকদের পুরোপুরি নিষিদ্ধ।

তাওয়াং থেকে ফেরার সময় মনে হবে ভগবান বুদ্ধই যেন বিরাজ করছেন এই অসাধারণ পার্বত্য উপত্যকায়। দূরের পাহাড়ে সোনালি রোদ হাওয়ায় মিশে যেন ছড়িয়ে পড়ছে গোটা উপত্যকায়। গুম্ফার চারপাশে উড়তে থাকা প্রেয়ার ফ্ল্যাগেও সেই আশ্চর্য আলোর ছোঁয়া।

খুবই কাজের রকেট ছিল এস এল ভি-৩

'রোহিণী' উপগ্রহ মহাকাশে সফলভাবে উৎক্ষেপণ করে একসময় খুবই বিখ্যাত হয়েছিল সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রযুক্তিতে তৈরি রকেট এস এল ভি-৩। কেমন ছিল এই রকেট? জানিয়েছেন প্রদীপচন্দ্র বসু

মহাকাশচর্চার প্রথম পর্বে আমাদের দেশের মহাকাশবিজ্ঞানীরা এস এল ভি সিরিজের রকেট তৈরি করেছিলেন। এর মধ্যে এস এল ভি-৩ খুবই কাজের রকেট ছিল। এস এল ভি-র পুরো নাম 'স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল'। বাংলায় বললে, উপগ্রহ উৎক্ষেপণকারী মহাকাশযান। এই এস এল ভি-৩-এর সাহায্যে ভারত নিজস্ব উপগ্রহ 'রোহিণী'কে মহাকাশ কক্ষপথে স্থাপন করে এবং পৃথিবীর মহাকাশচর্চায় অগ্রণী দেশগুলির সঙ্গে প্রথম সারিতে বসে। রকেটের সব ব্যবস্থা কেমন জটিল হয় তা এস এল ভি-৩-এর মতো একটি ছোট বহুস্তর রকেটকে খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায়।

এস এল ভি-৩ চার স্তরের রকেট। প্রথম স্তরের ব্যাস ১০০০ মিমি। এক বিশেষ ধরনের ইস্পাত দিয়ে তৈরি এই স্তরের রকেটের দৈর্ঘ্য ১০.০৪ মিটার এবং ওজন ১০.৯ টন। জ্বালানি হিসেবে থাকত ৮.৯ টন পলিবুটাডিন এক্রিল নাইট্রাইট। প্রথম স্তরের রকেটের ঘাত সৃষ্টি করার গড় ক্ষমতা ছিল ৪৫ টন।

প্রথম স্তরের রকেটের মতো দ্বিতীয় স্তরের রকেটও একই ধরনের ইস্পাত দিয়ে তৈরি। একই জ্বালানি এই স্তরেও ব্যবহৃত হত। দ্বিতীয় স্তরের ব্যাস ৮০০ মিমি, দৈর্ঘ্য সাড়ে ছয় মিটার, ওজন ৪.১ টন এবং এতে থাকত ৩.২ টন জ্বালানি। গড়ে ২০ টন ঘাত বা ধাক্কা সৃষ্টি করার ক্ষমতা ছিল দ্বিতীয় স্তরের।

তৃতীয় স্তরের রকেটের ব্যাস দ্বিতীয় স্তরের সমান। এক বিশেষ ধরনের প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি এই স্তরের দৈর্ঘ্য আড়াই মিটার, ওজন ১.২ টন এবং এতে দু' টন হাই এনার্জি ফুয়েল-২০ জ্বালানি হিসেবে থাকত। তৃতীয় স্তরের রকেটের গড় ধাক্কা সৃষ্টি করার ক্ষমতা ছিল সাড়ে ছয় টন।

একই ধরনের প্লাস্টিক দিয়ে চতুর্থ স্তরের রকেট তৈরি। জ্বালানিও এক, থাকত মাত্র ২৬৪ কেজি। ৬৫০ মিমি ব্যাস যুক্ত এই স্তরের দৈর্ঘ্য ১.৬ মিটার এবং মোট ওজন ৩০০ কিলোগ্রাম। গড়ে ২.২ টন ধাক্কা সৃষ্টি করার ক্ষমতা ছিল এই স্তরের রকেটের।

এস এল ভি-র চার স্তরের প্রতিটি স্তর অপর স্তরের সঙ্গে অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় দিয়ে যুক্ত থাকত। দুই স্তরের মধ্যবর্তী অংশে থাকত বিশেষ নিয়ন্ত্রণ ও আলাদা হওয়ার ব্যবস্থা। এ ছাড়া প্রতিটি স্তরের রকেটের জন্য ছিল একক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। প্রথম স্তরে ছিল থ্রাস্ট ভেক্টর কন্ট্রোল ও ফিল টিপ কন্ট্রোল। অগ্নি সংযোগের পর এস এল ভি-৩ ওপরে উঠতে আরম্ভ করলে এক নির্দিষ্ট পথে চালিত করতে রকেটের মূল জ্বালানির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হত আর-একধরনের জ্বালানি, যার নাম স্ট্রনশিয়াম পারক্লোরেট। এই জ্বালানি ঘাত সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করে পার্শ্বশক্তি তৈরি করে রকেটকে সোজা রাখতে। নিয়ন্ত্রণের এই পদ্ধতিকে বলে থ্রাস্ট ভেক্টর কন্ট্রোল।

সব ধরনের রকেটের মতো এস এল ভি-৩ ভূপৃষ্ঠ থেকে খানিকটা ওপরে উঠে গেলে ফিল টিপ কন্ট্রোল কাজ শুরু করত। ফিন বা পাখনা রকেটের প্রথম স্তরের নীচের দিকে লাগানো থাকে। এই পাখনাকে ডাইনে-বাঁয়ে বা সামনে-পেছনে ১৫ ডিগ্রি হেলানো যায়। সঠিক পথ থেকে বিচ্যুতি ঘটলে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় এই পাখনা আন্দোলিত হয়ে বায়ুগতি শক্তির প্রভাবকে নিয়ন্ত্রিত করে রকেটকে লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়। এই সময় ফিন টিপ কন্ট্রোল ব্যর্থ হলে থ্রাস্ট ভেক্টর কন্ট্রোল কাজ শুরু করে। উৎক্ষেপণের পরে নির্দিষ্ট উচ্চতায় ওঠার পর রকেটের প্রথম স্তর আলাদা হয়ে গেলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের রকেটের গতি ও পথ নিয়ন্ত্রণ

করা হয় আরও কয়েকটি তরল জ্বালানি রকেট ব্যবহার করে। এস এল ভি-৩-এর চতুর্থ স্তরে কোনও নিয়ন্ত্রণ রকেট থাকত না। তার বদলে ওই স্তরে থাকত এমন একটি ছোট্ট রকেট যা মহাকাশযানটিকে কক্ষপথে লাট্টুর মতো ঘুরিয়ে দিত। সব মিলিয়ে এ-কথা বলা যায়, ওড়ার সময় যে-কোনও মহাকাশযানের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অনেকাংশে নির্ভর করে কার্যকর জ্বালানি ব্যবহারের ওপর। এইসব জ্বালানির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হাইড্রাজিন ও ধূমায়মান নাইট্রিক অ্যাসিড।

এস এল ভি-৩-কে কক্ষপথে নিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক দায়িত্বে থাকত পরিচালন কক্ষে বসানো দুটি প্রধান যন্ত্র জাইরোস্কোপ ও একসেলেরোমিটার। মহাকাশযানের অবস্থান ও গতিবেগের হিসেব রাখত এই দুই যন্ত্র। অটো পাইলট রকেট এঞ্জিন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ইসরোর বিজ্ঞানীদের তৈরি করে দেওয়া পথনির্দেশিকা অনুযায়ী মহাকাশযানটিকে সঠিক লক্ষ্যের দিকে চালাত। উড়ন্ত অবস্থায় যে-কোনও মহাকাশযানকে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ করার আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র সিকোয়েন্সার যা বিভিন্ন যন্ত্রের কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। রকেটের এক-একটি স্তরের আলাদা হয়ে যাওয়া ও পরবর্তী স্তরে অগ্নিসংযোগ এই সিকোয়েন্সারের মাধ্যমে হয়।

জাইরোস্কোপ, একসেলেরোমিটার, অটোপাইলট, সিকোয়েন্সার ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রগুলি একটি মহাকাশযানের যে কক্ষে থাকে তাকে বলে ইকুইপমেন্ট বে। প্রযুক্তিবিদরা বলেন এই কক্ষ মহাকাশযানের মস্তিষ্ক। এস এল ভি-৩-এর এই মস্তিষ্ক থাকত তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরের সংযোগস্থলে। মহাকাশযানের মাথায় যে জিনিসপত্র রাখা হয় তাকে মহাকাশ প্রযুক্তির ভাষায় বলে, পে লোড। এই পে লোড বোমাও হতে পারে আবার দূরসঞ্চারী উপগ্রহ বা কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটও হতে পারে। এস এল ভি-৩-এর ক্ষেত্রে পে লোডে রাখা উপগ্রহে চতুর্থ স্তরের রকেটের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকত।

আগেই লিখেছি, একটি বহুস্তর রকেট দিয়ে নির্মিত মহাকাশযানের সব ব্যবস্থা ভীষণ জটিল হয়। এস এল ভি-৩ ফ্রান্সের এরিয়েন বা আমেরিকার স্যাটার্ন বা রাশিয়ার সয়ুজ-এর তুলনায় খুবই ছোট ছিল। তবুও এতে ছিল ৪৪টি প্রধান গঠনতন্ত্র (সিস্টেম), ২৫০টি উপ-গঠনতন্ত্র (সাব-সিস্টেম) এবং প্রায় ১ লক্ষ যন্ত্রাংশ। ৪০,০০০ বন্ধনী ব্যবহার করে ১০ লক্ষেরও বেশি ঝালাই দিয়ে এগুলিকে জোড়া দেওয়া হত। চার স্তরের রকেটের ভেতর পুরো বিদ্যুৎ ব্যবস্থা করতে ২৫ কিলোমিটার বৈদ্যুতিক তার প্রয়োজন হত। এ ছাড়াও হাজার-হাজার বৈদ্যুতিক ও বৈদ্যুতিন যন্ত্রাংশ এস এল ভি-৩-এর ৫৬০ রকমের কাজের ব্যবস্থাকে চালু রাখত।

যেকোনও পরীক্ষায় অনিবার্য

সৌরেন চট্টোপাধ্যায়ের

৫০০১ কুইজ ৫০

জানা-অজানা ১০০১ ৫০

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের

বিজ্ঞানের ৫০১ কী ও কেন ৪০

আপ-টু-ডেট সায়েন্স কুইজ সমগ্র ২৫

সাহিত্য তীর্থ : ৮/১বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩।

মিলেনিয়াম ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স ২০০০
অ্যান্ড জেনারেল নলেজ ১৮ অজানার সন্ধানে ১২
এক ঝলকে খাস খবর ১০ তবু জেনে রাখুন ১০

স্বরলিপি পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫০

হেমন্ত ৩৬০ মান্না ২৬০ শ্যামল ৩১৫ কিশোর ২৬০
শানু ২১৫ লতা ২০৫ আশা ১৫৫ পুরনো দিনের
গান ১৯০ সন্ধ্যা/আরতী/মঃ রফি/শ্রীকান্ত আচার্য

সুভাষ নাথ পুস্তকালয় : স্টল নং ৮, ভবানী দত্ত লেন,
কলিকাতা-৭৩ কলেজ স্ট্রীট জংশন

কেন বহুস্তরী রকেট

ভূপৃষ্ঠ থেকে অনেক, অনেক ওপরে মহাকাশে উপগ্রহ স্থাপনের জন্য বা মহাকাশ স্টেশনে মালপত্র পৌঁছতে এমন রকেট দরকার, যা প্রচণ্ড গতিবেগ সৃষ্টি করে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের মায়া কাটিয়ে মহাকাশে যেতে পারে। এ কাজ একস্তর রকেট দ্বারা সম্ভব নয়। এজন্য ব্যবহৃত হয় বহুস্তর রকেট। এ ছাড়া বাতাস কেটে যাওয়ার সময় উঁচু গতিবেগে ত্বরণ সৃষ্টি করতেও বহুস্তর রকেট প্রয়োজন। ত্বরণ বললে, কোনও গতিশীল বস্তুর মহাকাশে গতি পরিবর্তনের হারকে বোঝায়। উৎক্ষেপণের পর বহুস্তর রকেটের প্রথম স্তরের জ্বালানি ফুরিয়ে গেলে প্রথম স্তরটি খসে পড়ে এবং মহাকাশযানটির ওজন অনেক কমে যায়। ফলে মাধ্যাকর্ষণের টানও কমে এবং একই সঙ্গে উর্ধ্বাকাশে বাতাসের স্তর ক্রমশ হালকা হয়ে আসায় ওপরে ওঠার পথে বাধাও ক্রমশ কমে। এ সময় মহাকাশযানটির গতি দ্রুত বেড়ে যায়। ত্বরণও সৃষ্টি হয় বেশি। ত্বরণ না বাড়লে মহাকাশের শূন্যতায় মহাকাশযানের গতিবেগ বাড়ানো সম্ভব নয়।

ভূপৃষ্ঠ থেকে উৎক্ষেপণের পর মহাকাশে যাওয়ার সময় এস এল ভি-৩-এর প্রথম স্তরের রকেট মহাকাশযানটিকে সেকেন্ডে ১.৪ কিমি গতিতে ১৮ কিমি ওপরে তুলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। এর পর দ্বিতীয় স্তরের রকেট প্রতি সেকেন্ডে ২.৭ কিমি গতিতে যানটিকে ওপরের দিকে ৭২ কিমি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার পর তৃতীয় স্তরের রকেট নিত ১৪০ কিমি ওপরে। তৃতীয় স্তরে রকেটের গতি থাকত সেকেন্ডে ৪.৬ কিমি। সব শেষে চতুর্থ স্তরের রকেট এই মহাকাশযানকে ভূপৃষ্ঠ থেকে ২৯৬ কিমি ওপরে তুলে মহাকাশে সেকেন্ডে ৭.৭৯ কিমি গতিবেগে ছেড়ে দিতে পে লোডে রাখা উপগ্রহটিকে। তখন উপগ্রহটির উপবৃত্তাকার কক্ষপথ হত ৬০০ কিমি × ২৮৫ কিমি।

সব ধরনের রকেটের মতো এস এল ভি-৩-এর শীর্ষদেশও তীক্ষ্ণ আকৃতির হত। প্রচণ্ড গতিবেগে ওপরে ওঠার সময় বাতাসের প্রতিরোধ কম করতে শীর্ষদেশ ঢাকা থাকত ফ্লো রাউন্ড দিয়ে। এই ফ্লো রাউন্ড বাতাসের ঘর্ষণ ও প্রচণ্ড উত্তাপ থেকেও নভোযানকে রক্ষা করত যতক্ষণ না কক্ষপথে উপগ্রহটিকে স্থাপন করা হয়।

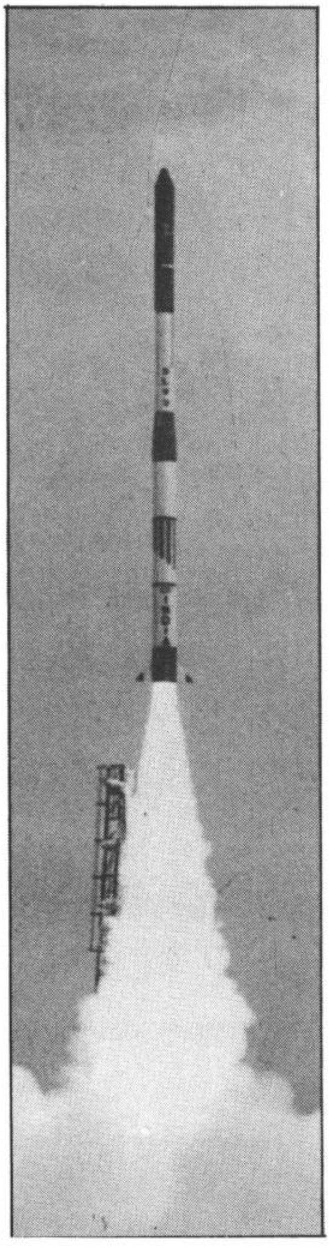

দেখে মনে হয় আঁকিবুকি আসলে তা নয়

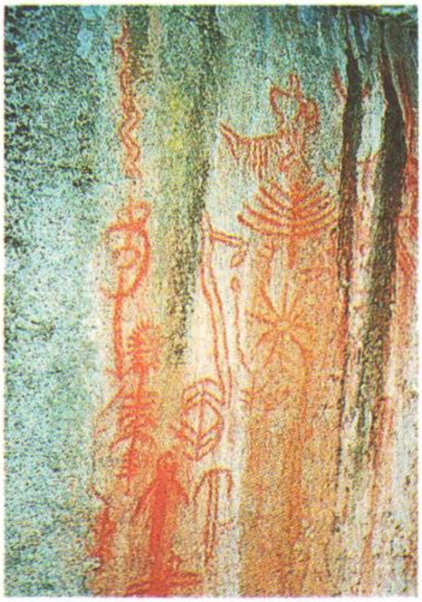

পাথরের গায়ে আঁকা চিত্রলিপি

দানাশস্যের খোসা ছাড়াবার জন্য পাথরের এই গর্তকে কাজে লাগাত মোনো ইন্ডিয়ানরা ফোটো : লেখক

মধ্য ক্যালিফোর্নিয়ার সিয়েরা নেভেদা শৈলশ্রেণীতে আছে অ্যাশ মাউন্টেন। সেখানকার পটয়িসা মোনো ইন্ডিয়ানদের পাথরের গায়ে আঁকা চিত্রলিপির কথা লিখেছেন **জলধর মল্লিক**

ছবিটা দেখলে কী মনে হয়? পাথরের গায়ে কিছু হিজিবিজি আঁকাবুকি বুঝি-বা। হ্যাঁ, আঁকাবুকি তো নিশ্চয়ই। তবে হিজিবিজি নয় মোটেই। কারণ, এটা যেমন তেমন আঁকিবুকি নয়। মাথা খাটিয়ে কাজটা করা। এই আঁকিবুকির একটা মানে আছে। যারা এই আঁকাবুকি পড়তে জানে, তারাই শুধু বলতে পারবে কী কথা বলা বয়েছে ওটায়। আসলে, এটা এক ধরনের লেখা। ছবির পর ছবি সাজিয়ে লেখা। এই ধরনের ছবি দিয়ে লেখার নাম 'পিক্টোগ্রাফ' (Pictograph)। বাংলায় কী বলব? চিত্রলিপি। বর্ণমালার ওপর ভর করে আমরা লেখালেখির কাজ সারি। চিত্রলিপি হল বর্ণমালার একরকম পুরুষ। আদ্যিকালের চিত্রলিপি বদলাতে বদলাতেই একদিন বর্ণমালার রূপ পেয়েছে। অনেক দেশেই এমন চিত্রলিপির দেখা পাওয়া যায়। আদ্যিকালে আদিবাসীদের সৃষ্টি এসব।

ছবিতে যে চিত্রলিপির নমুনাটা দেখা যাচ্ছে, এটা হল মোনাসে বা পশ্চিমি মোনো ইন্ডিয়ান নামের উত্তর আমেরিকার এক আদিবাসী গোষ্ঠীর। এই গোষ্ঠীর এক উপগোষ্ঠীর নাম পটয়িসা মোনাসে ইন্ডিয়ান। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি থেকে বোঝা যায়, এরা অন্ততপক্ষে ১৩৫০ সাল নাগাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের হসপিটাল রক বলে একটা পাহাড়ি জায়গার কাছাকাছি থাকত। এখন এই হসপিটাল রক ছুঁয়ে আরও ওপরে উঠে গেছে জেনারেল হাইওয়ে। প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ ওই জেনারেল হাইওয়ে ধরে দেখতে যায় সমুদ্রতল থেকে প্রায় দু' হাজার মিটার উঁচুতে ছড়িয়ে-থাকা পৃথিবীবিখ্যাত সিকোয়া ন্যাশনাল পার্ক। এই পার্কে রয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বিশালাকার বৃক্ষ 'জেনারেল শেরম্যান'। সাধে কি আর একে 'দৈত্য বৃক্ষ' বলে।

বয়স দু' হাজার বছর ছাড়িয়ে গেছে। প্রায় ২৭৫ ফুট লম্বা এই গাছটি এখনও জীবন্ত। এমন বিশালকায় গাছ নিজের চোখে দেখতে হলে যেতে হবে ক্যালিফোর্নিয়ার লস আঞ্জেলিস, কিংবা সানফ্রান্সিসকো শহরে, অথবা কাছাকাছি কোনও জায়গায়। ওখান থেকে গাড়িতে চেপে হুস করে চলে যাওয়া যায় ছোট্ট শহর ভিসালিয়ায়। এখান থেকে ১৯৮ নং হাইওয়ে ধরে চলে যেতে হয় মধ্য-ক্যালিফোর্নিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে থাকা সিয়েরা নেভেদা শৈলশ্রেণীর দিকে। ওখানেই রয়েছে অ্যাশ মাউন্টেন নামে পর্বত। আর এই পর্বতে জেনারেল হাইওয়ে দিয়ে ঢোকার মুখেই পড়ে হসপিটাল রক, যেখানে পটয়িসা মোনো ইন্ডিয়ানদের চিত্রলিপি রয়েছে। পাশেই আছে পাথরের বুকে বেশ কয়েকটা গর্ত। দানাশস্যের খোসা ছাড়াবার জন্য সেগুলি গর্তে ফেলে পাথরের টুকরো দিয়ে ঘা মারত ওরা। কাছেই দেখা যায় ওই আদিবাসীদের কিছু স্মৃতি চিহ্ন। সমুদ্রতল থেকে ৬৩৪ মিটার উঁচুতে হসপিটাল রক পটয়িসা মোনো ইন্ডিয়ানদের পাথরের গায়ে আঁকা চিত্রলিপি সিকোয়া ন্যাশনাল পার্কগামী পর্যটকদের কাছে আজ অবশ্যদ্রষ্টব্য বিষয়।

মহেন্দ্রলালের জন্যই গবেষণা করতে পেরেছিলেন সি ভি রামন

চিকিৎসাবিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র মহেন্দ্রলাল ছিলেন বিজ্ঞানীদের গুরু। এদেশে বিজ্ঞান অনুশীলনের জন্য তিনি স্থাপন করেছিলেন 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভা'। মহেন্দ্রলাল সরকারের ছাত্রজীবনের কথা লিখেছেন **বারিদবরণ ঘোষ**

কলকাতার মেডিকেল কলেজে ফিফ্থ ইয়ারের ক্লাস নিচ্ছিলেন চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আর্চার। চোখ নিয়ে ছাত্রদের নানা প্রশ্ন করছিলেন। ছেলেদের কেউই তেমন উত্তর দিতে পারছিলেন না। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন কলেজের সেকেন্ড ইয়ারের একটি ছাত্র। বড় জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে প্রশ্নগুলো শুনে উচিত নয় জেনেও বেশ জোরে জোরে উত্তরগুলো দিচ্ছিলেন। ডাক্তার আর্চার বলে উঠলেন, "হু ইজ দ্যাট ফেলো!" একটুও রাগ না করে তিনি ছেলেটিকে ঘরের মধ্যে ডাকিয়ে নিয়ে এলেন। তারপর আরও সব প্রশ্ন করতে লাগলেন। ছেলেটি একটুও ঘাবড়ে না গিয়ে সব প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দিতে লাগলেন। পঞ্চমবার্ষিক শ্রেণীর ছেলেরা পর্যন্ত অবাক।

হাওড়া পাইকপাড়ার মহেন্দ্রলাল সরকার (১৮৩৩-১৯০৪) নামের এই ছেলেটি এম এল এস পরীক্ষায় মেডিসিন, সার্জারি এবং মিডওয়াইফারি বিষয়ে অনার্স পেয়ে এই পরীক্ষার সব পদক জিতে নেন। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে উত্তীর্ণ হন এম.ডি পরীক্ষায়। প্রথম এম.ডি ছিলেন চন্দ্রকুমার দে, মহেন্দ্রলাল এদেশের দ্বিতায় এম.ডি।

এ-সময়েই সারা বিশ্বে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রবর্তন করে যুগান্তকারী ঘটনা ঘটিয়েছিলেন সুখ্যাত ডাঃ হ্যানিম্যান। নবস্থাপিত ব্রিটিশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের কলকাতা শাখা থেকে এই চিকিৎসাকে মহেন্দ্রলাল 'হাতুড়ের চিকিৎসা' বলে তীব্রভাবে আক্রমণ করলেন। শুনে তাঁরই ঘনিষ্ঠ বন্ধু বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক রাজেন্দ্র দত্ত তর্ক করতে লাগলেন। এরই মধ্যে ডাঃ সরকারের এক বন্ধু মর্গ্যানের লেখা 'ফিলজফি অব হোমিওপ্যাথি' বইটি সমালোচনার জন্য ডাঃ সরকারকে দিলেন। বইটি পড়ে তিনি অবাক!

কিন্তু কোনও বিষয়কে যাচাই না করে তিনি কোনও সিদ্ধান্ত নেন না। এতএব বন্ধু ডাঃ দত্ত-র কাছে গিয়ে রোগের চিকিৎসা স্বচক্ষে দেখলেন, এবং হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠলেন। ওই ব্রিটিশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের একটি সভায় তিনি প্রকাশ্যেই হোমিওপ্যাথির গুণগান করলেন। শুনে ডাঃ ওয়ালার এবং অন্য কয়েকজন সাহেবডাক্তার রেগে গিয়ে মহেন্দ্রলালকে সভা থেকে পদচ্যুত করলেন। মহেন্দ্রলালের সব পসার-প্রতিপত্তি গেল। তিনি বললেন, "আমি চাষির ছেলে, না হয় সামান্য কাজ

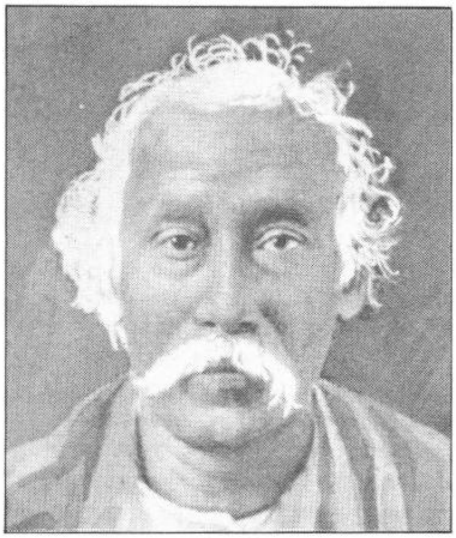

করে খাব, তাতে আর কী? সত্যি যা, তা তো বলতে এবং করতেই হবে।"

পরে আবার তাঁর পসার বাড়ল। সত্যকে তিনি এভাবেই ঘোষণা করলেন। এদেশে বিজ্ঞান অনুশীলনের জন্য তিনি তাই একটি সভা স্থাপন করলেন, 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা' —এটিই পরে যাদবপুরের বিখ্যাত বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্স' নামে পরিচিত হয়। পরে বউবাজার আর কলেজ স্ট্রিটের মোড়ের এই গবেষণাগারেই গবেষণা করতে এলেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন। এখান থেকে গবেষণা করেই (আলোকবিকিরণ তত্ত্ব—'রামন এফেক্ট' নামে খ্যাত) তিনি নোবেল পুরস্কার পান (১৯৩০)। এশীয়বাসীদের মধ্যে এই প্রথম বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ পাওয়া সম্ভব হল। ডাঃ রামন তাই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলেছিলেন, মহেন্দ্রলাল সরকারের জন্যই তিনি গবেষণা করতে পেরেছিলেন এবং পরে এই সম্মান পেতে সমর্থ হন।

বিজ্ঞানতাপস মহেন্দ্রলাল তাই বিজ্ঞানীরও গুরু। বহু সম্মানে ভূষিত এই বিজ্ঞানসাধক বৈদ্যনাথে বসবাসের সময় কুষ্ঠরোগীদের সেবার জন্য একটি বাড়ি তৈরি করেন। সেটি স্ত্রী রাজকুমারী'র নামে উৎসর্গ করে ব্যবস্থা করেন চিকিৎসার। মহেন্দ্রলাল তাই বিজ্ঞানসেবকও।

ধা রা বা হি ক

আগে যা ঘটেছে : অর্জুন, গোরানসাহেব এবং পুলিশ অফিসার উত্তমকুমার এসে পড়ল হুতোমপুরের জঙ্গলে। জঙ্গলে কারা ফেলে গেল দুটো মৃতদেহ, রক্তশূন্য। ওদের শরীর থেকে সমস্ত রক্ত বের করে নিয়েছে। এর পর অর্জুন চলে এল কাবুলের বাড়িতে। কাবুলের দুটি পা নেই। কাবুলের বন্ধুরা টাকা সংগ্রহ করছে ওর চিকিৎসার জন্য। বন্ধুরা ওকে আমেরিকায় পাঠাতে চায়। কাবুলের ঘরে খুঁজে পাওয়া গেল নগদ তিন লক্ষ সত্তর হাজার টাকা। এত টাকা ওকে কে দিল? তান্ত্রিক গোরক্ষনাথ পড়েছে সমস্যায়। সে সংগ্রহ করেছে খোঁড়া শকুন আর কালো বেড়াল। এখন দরকার একটি কানা কাক। যদি পাওয়া যায়, তবে এই প্রাণীর আত্মা দিয়ে সে তৈরি করতে পারবে ড্রাকুলা। সন্দীপ ও সন্দীপের বন্ধুদের থানায় ধরে নিয়ে গেছে পুলিশ। মেজর, গোরানসাহেব আর গোরক্ষনাথকে নিয়ে গাড়িতে উঠল অর্জুন। গাড়ি ছুটছে হাসিমারার জঙ্গলের দিকে। মাদারিহাটে এসে অর্জুনদের চা খেতে খেতে আলাপ হয়ে গেল লোকনাথের সঙ্গে। তিনি মাইল কুড়ি দূরে ব্রিটিশ আমলের একটা বাড়ি কিনেছেন। গভীর জঙ্গলে সে বাড়ি। সেখানেই রাতে থাকার সিদ্ধান্ত নিল সবাই। সেই বাড়ির পাশেই বহু প্রাচীন কয়েকটি সমাধিবেদি। লম্বায় প্রায় বারো ফুট কুচকুচে এক কালো সাপ এসে ঢুকল সমাধিবেদিতে। এদিকে গোরানসাহেবের আর তর সইছে না। তাঁর অনুমান দশ বারো মাইলের মধ্যেই আছে ড্রাকুলা। মধ্যরাতে ড্রাকুলার খোঁজে বেরিয়ে পড়ল সকলে। প্রথমে গোরানসাহেব, তারপরে মেজর এবং অর্জুন। শেষে গোরক্ষনাথ। তার কাঁধে ঝুলছে তিনটি খাঁচা। হঠাৎ একটা রাতের পাখি চিৎকার করে উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। তারপর ...

ড্রাকুলার সন্ধানে অর্জুন

সমরেশ মজুমদার

১৫

ব্যাপারটা অস্বস্তিকর। গোরানসাহেব শিক্ষিত, পণ্ডিত মানুষ, তিনি বলেছেন এখানে ড্রাকুলা এসেছিল। গোরক্ষনাথ অশিক্ষিত, সংস্কারাচ্ছন্ন, তার কথায় কান দেওয়ার কোনও যুক্তি নেই, সে ওই কথা বলতেই পারে। কিন্তু বেড়াল কাক শকুন এমন অদ্ভুত আচরণ করবে কেন? অতদূরে বুকে-হাঁটা সাপটাকে কানা কাক দেখে ভয় পেয়ে চিৎকার করবে, এটাও তো ভাবা যায় না।

হঠাৎ হাওয়া বইতে লাগল। ওরা মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখল সেটা যেন ঝড়ের চেহারা ছিল। ঝড় হচ্ছে অথচ আকাশে একফোঁটাও মেঘ নেই। পাশে এসে দাঁড়িয়ে মেজর বললেন, "হচ্ছেটা কী?"

সামনের জঙ্গলটা এখন অস্থির। গাছগুলো প্রবলবেগে ডালপালা নেড়ে চলেছে। কয়েক সেকেন্ড এইরকম চলার পর আচমকা প্রকৃতি শান্ত হয়ে গেল। হঠাৎ গোরানসাহেব চিৎকার করলেন, "লুক।"

অর্জুন দেখল একঝাঁক বাদুড়জাতীয় প্রাণী গাছগুলো থেকে উড়ে আসছে। ওদের উড়ে আসার ভঙ্গিটা খুব হিংস্র। গোরানসাহেব টর্চের আলো ফেলতে চাইলেন ওদের ওপরে। গোরক্ষনাথ তৎক্ষণাৎ লাঠিসুদ্ধ খাঁচাগুলোকে ওপরে তুলে নিল। নিতেই কাক বেড়াল এমনকী শকুনটাও চিৎকার শুরু করে দিল। নীচের দিকে শোঁ শোঁ করে নেমে আসা বাদুড়গুলো ঢেউয়ের মতো ওপরে উঠে গিয়ে পাহাড়ের দিকে চলে যেতেই গোরক্ষনাথের পোষ্যরা শান্ত হল। মেজর তাকিয়ে ছিলেন পাহাড়ের দিকে, বললেন, "চশমাটা পাল্টাতে হবে। মনে হচ্ছে পাওয়ার বেড়েছে।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

"বাদুড়গুলো আচমকা ঝাপসা হয়ে গেল, দেখতে পেলাম না।"

চাঁদ ডুবে যাচ্ছে পাহাড়ের ওপাশে। হঠাৎ জ্যোৎস্না চলে যাওয়ায় অন্ধকার ঘন হয়ে গেছে বেশ। গোরানসাহেব বললেন, "এবার ফিরে যাওয়া যাক। প্রথমদিনের পক্ষে যথেষ্ট হয়েছে।"

মেজর খুব খুশি হলেন। পকেট থেকে একটা নিব্ বের করে খানিকটা তরল পদার্থ গলায় ঢেলে বললেন, "ফেরা যাক। এখনই ভোর হবে। তোমরা নিশ্চয়ই বাংলোয় ফিরে গিয়ে বিছানায় উঠে বসবে কিন্তু আমি এই জঙ্গলের ভোরটাকে লনে বসে এনজয় করব। আন্ডারস্ট্যান্ড?"

কেউ জবাব দিল না। গোরানসাহেবের টর্চের আলো ওদের পথ দেখাচ্ছিল। একটু একটু করে অন্ধকার পাতলা হয়ে আসছে। এবার বাংলোর পেছনটাকে দেখতে পেল ওরা। ছায়া ছায়া, অস্পষ্ট। হঠাৎ অর্জুন দাঁড়িয়ে গেল। সে কি ঠিক দেখছে? কোনও মানুষের ওখানে দাঁড়িয়ে থাকার কথা নয়। কিন্তু লম্বা গাউন পরা কেউ কি ওখানে দাঁড়িয়ে! সে মেজরের হাত ধরে দাঁড় করালো, "দেখুন তো, বাংলোর পেছনে কাউকে চোখে পড়ে কিনা?"

মেজর দেখলেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, "উঁহুঁ, না। অবশ্য আমার এই চশমাটাকে পালটাতে হবে। তবু বলছি, না। ওখানে এখন কে যেতে পারে? আমাদের ড্রাইভারটা? ব্যাটার ঘুম ভেঙে যাওয়ায় ওখানে যাবে কেন? সাপের খবরটা কি জানে না বুদ্ধুটা?"

গোরানসাহেব দাঁড়িয়ে গেলেন, "কী হয়েছে?"

মেজর আবার হাঁটা শুরু করে তাঁর কাছে পৌঁছে অর্জুনের কল্পনার কথা বললেন। গোরানসাহেব অর্জুনের দিকে তাকালেন, "তুমি কি কোনও লম্বা ফিগার দেখেছ, যার পোশাক কালো? একটু বেঁকে দাঁড়ানো?"

অর্জুন বলল, "হ্যাঁ, যদিও আমি ঠিক নিশ্চিত নই!"

"আমিও দেখেছিলাম। কিন্তু পরে বুঝলাম ওটা একটা সরু গাছ। প্রচুর পাতা থাকায় এতদূর থেকে কালো পোশাক পরা মানুষের মূর্তি বলে মনে হচ্ছে। চল।"

বাংলোয় পৌঁছবার আগেই ভোর হয়ে গেল। রোদ ওঠেনি, সূর্যের দেখা পাওয়া যায়নি কিন্তু তিনি আসছেন জানিয়ে চমৎকার এক আলোয় পৃথিবী আলোকিত হল। এখন অন্ধকার যা আছে তা গাছের পাতার আড়ালে।

বারান্দায় উঠে এসে দেখা গেল বসার ঘরের দরজাটা খোলা। মেজর বললেন, "সর্বনাশ। দরজা খোলা কেন? কেউ কি ঢুকেছিল?"

অর্জুন হেসে বলল, "পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা চোর এতদূরে জঙ্গলের

সূর্যের দেখা পাওয়া যায়নি কিন্তু তিনি আসছেন জানিয়ে চমৎকার এক

মধ্যে চুরি করতে অন্তত রাত্রে আসবে না। হাওয়ায় খুলে গেছে। তখন ঝড় উঠেছিল।"

মেজর বললেন, "আমি চোরের কথা বলছি না। যার সন্ধানে আমরা এখানে এসেছি তিনি যদি ঘুমন্ত ড্রাইভারকে একা পেয়ে চলে আসেন?"

অর্জুন বসার ঘরে ঢুকল। ঘরের ভেতরে এখনও আলো ঢোকেনি। সে দ্রুত চলে গেল চার নম্বর ঘরের দরজায়। দেখল বটা উপুড় হয়ে শুয়ে আছে বিছানায়। ওর শোয়ার ভঙ্গি দেখে ঘাবড়ে গেল অর্জুন। ধীরে-ধীরে বিছানার পাশে এসে সে ডাকল, "বটা, বটা!"

বটা কোনও সাড়া দিল না।

ইতিমধ্যে গোরক্ষনাথ এবং মেজর এসে দাঁড়িয়েছেন পাশে। মেজর চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "ডেড?"

অর্জুন জবাব দিল না। মেজর বললেন, "গলার পাশে দাঁতের দাগ আছে কিনা ভাল করে দ্যাখো তো?"

কিন্তু সেটা দেখার আগেই গোরক্ষনাথ বটার পায়ের আঙুল ধরে ঝাঁকুনি দিল। "বটাবাবু। ও বটাবাবু?"

সঙ্গে-সঙ্গে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল বটা। প্রথমে বুঝতে না পারলেও খুব তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বলল, "আপনারা ফিরে এসেছেন? যাক বাবা। খুব চিন্তা হচ্ছিল আপনাদের নিয়ে। কারও কোনও বিপদ হয়নি তো?"

হঠাৎ হো হো করে হাসতে লাগলেন মেজর, দু'হাতে ভুঁড়ি চেপে। হাসতে হাসতেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বটা অবাক হল, "কী ব্যাপার বাবু?"

"কিছু না। চা খাওয়াতে পারো?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"পাঁচ মিনিটের মধ্যে করে দিচ্ছি।" বটা বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াল।

বাইরের বারান্দায় তখন মেজর গোরানসাহেবকে প্রবলবেগে হাত নেড়ে বোঝাচ্ছিলেন এই তল্লাটে দু-এক পিস ভূত থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু ড্রাকুলা নেই। তাঁর বক্তব্য, ড্রাকুলা থাকলে বটার ঘুম এ জীবনে ভাঙবে না। এতবড় খালি বাংলোয় ঘুমন্ত বটাকে পেয়েও যখন ড্রাকুলা তার রক্ত খেতে আসেনি তখন প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে তিনি এই অঞ্চলে নেই।

অর্জুন এসে কথাগুলো শুনল। গোরানসাহেব কোনও জবাব না দিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। মেজর অর্জুনকে বললেন, "একবার মাছ ধরতে গিয়েছিলাম কঙ্গোতে, ওখানে ব্ল্যাক লেক বলে বিশাল হ্রদ আছে। শুনেছিলাম আমাদের কাতলা মাছের তিন ডবল সাইজের একটা মাছ, যাকে ওরা কুন্‌তা বলে, ওখানে পাওয়া যায়। ব্ল্যাক লেক লম্বায় মাইল

আলোয় পৃথিবী আলোকিত হল। অন্ধকার যা তা গাছের পাতার আড়ালে।

পাঁচেক, চওড়ায় আধ মাইল। তিনদিন ধরে বোট নিয়ে ছিপ ফেলেছি কিন্তু কুন্তার দর্শন পাইনি। ওরা নাকি দল বেঁধে থাকে। পাঁচ মাইল লম্বা লেকের কোথায় তাঁরা থাকতেন জানিনা। হাতে তিনদিনের বেশি সময় ছিল না বলে চলে আসতে হয়েছিল। এও দেখছি সেরকম। গোরান শুনেছে ডুয়ার্সের এইদিকে ড্রাকুলা আছে। আরে এইদিক বলতে কোনদিক? আমরা এখানে বসে আছি আর ড্রাকুলা হয়তো কোচবিহারে ঘুমোচ্ছে।"

গোরানসাহেব ফিরে এসে অর্জুনের পাশে চেয়ার টেনে বসলেন। ওঁর হাতে একটা মোটা ডায়েরি। তার পাতা ওলটাতে-ওলটাতে একটা জায়গায় থেমে মুখ তুললেন, "নাইনটিন ফর্টিওয়ানে ছয়মাসের মধ্যে লেখা হয়েছিল চিঠি তিনটে। আমি এখানে কপি করে রেখেছি। চিঠি লিখেছিলেন জন লিঙ্কন। প্রথম চিঠি, "ডিয়ার বব। আশা করি ভাল আছ। আমি এখন ইন্ডিয়ার বেঙ্গল প্রভিন্সের নর্থে বিনাহাট চা-বাগানের ম্যানেজার। সুন্দর বাংলো, প্রচুর কাজের লোক, যা ইচ্ছে তাই করার ক্ষমতা আমার আছে। ইন্ডিয়া স্বাধীন হতে চাইছে কিন্তু আমার এখানে কোনও গোলমাল নেই। আমি এই চিঠি লিখছি সম্পূর্ণ অন্য কারণে। আমার আগে এই বাগানের ম্যানেজার ছিলেন উইলিয়াম রাইট। তাঁকে একদিন একটি জঙ্গলের মধ্যে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাঁর গলায় দাঁতের চিহ্ন ছিল। সেই চিহ্ন কোনও পশু করেনি। আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার বলছেন তিনি নাকি জঙ্গলের গভীরে একটি বাংলোয় একা রাত কাটাতে গিয়েছিলেন। ওই বাংলোটি করেছিলেন একজন ব্রিটিশ টি প্ল্যান্টার, যিনি কয়েক বছর আগে মারা গিয়েছেন। এই ব্যাপারটা আমাকে খুব ভাবাচ্ছে। ভাল থেকো। শুভেচ্ছা নিও। জন লিঙ্কন।"

দ্বিতীয় চিঠি, "ডিয়ার বব, তোমার চিঠি পাওয়ার আগেই আবার লিখছি। মিস্টার রবার্টকে কোনও মানুষ খুন করেনি। যে ব্রিটিশ প্ল্যান্টারের বাংলোয় গিয়ে মিস্টার রাইট খুন হন, তাঁর মৃত্যু স্বাভাবিকভাবে হয়নি। ভদ্রলোক বিয়ে করেননি। ওঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে ওঁর দু'ভাই লন্ডন থেকে এসেছিলেন। ওই বাংলোয় রাত কাটাতে গিয়েছিলেন তাঁরা। পরের দিন দু'জনের মৃতদেহ রক্তশূন্য অবস্থায় পাওয়া যায়। তোমার কাছে অনুরোধ, লন্ডনের যেসব সংস্থা পরলোক নিয়ে গবেষণা করেন তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঘটনাগুলো জানাও। তাঁরা কী বলেন তা জানতে আমি খুব আগ্রহী। শুভেচ্ছা নিও। জন।"

তৃতীয় চিঠি, "ডিয়ার বব, তোমার চিঠি পেয়েছি। মনে হচ্ছে তুমি আমার দ্বিতীয় চিঠিটি পাওয়ার আগেই এই চিঠি লিখেছ। যাহোক, আমি খুব চিন্তায় আছি। আমার চা-বাগান হাসিমারা নামক মোটামুটি পরিচিত ব্যবসাকেন্দ্রের কাছে। এখানকার চার্চের ফাদার আমাকে সাবধান করে দিয়েছেন। ওই জঙ্গলের মধ্যে যে বাংলোটা আছে তার ধারেকাছে আমাকে যেতে নিষেধ করেছেন। বাংলোটা আমার বাগান থেকে অন্তত কুড়ি মাইল দূরে জঙ্গলের শেষে। অথচ সন্ধে হলেই মনে হয়, যাই গাড়ি নিয়ে ঘুরে আসি। গতরাত্রে একটা ঘটনা ঘটল। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল কোনও একটা শব্দে। দেখলাম আমার জানলার তারে একটা বাদুড় ঝুলছে। পোকামাকড় যাতে ঘরে না ঢুকতে পারে তাই তার লাগানো ছিল। এতবড় বাদুড় আমি কখনও দেখিনি। সঙ্গে-সঙ্গে বালিশের নীচ থেকে রিভলভার বের করে গুলি করলাম। বাদুড়টা নীচে পড়ে গেল। গুলির শব্দে কাজের লোকজন ছুটে এল। আলো জ্বেলে বাংলোর পাশে জানলার নীচটা খোঁজা হল। কিন্তু কোথাও বাদুড়টাকে পাওয়া গেল না। অথচ আমি নিজের চোখে দেখেছি ওর পেটে গুলি লেগেছিল। তুমি অবাক হবে শুনে, জানলার তারে একফোঁটাও রক্ত ছিল না। বুঝতেই পারছ, এসব কারণে আমি একটুও ভাল নই। ছুটির দরখাস্ত করেছি। পেলেই দেশে চলে যাব কিছুদিনের জন্যে। শুভেচ্ছা নিও।— জন।"

চিঠি পড়া শেষ করে গোরানসাহেব বললেন, "এই বাংলোটির কথাই জন লিঙ্কন তাঁর চিঠিতে লিখেছেন।"

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "জন নিশ্চয়ই ফিরে গিয়েছিলেন?"

"না। ওঁর বন্ধু চিঠিগুলো পরলোকচর্চার একটি সংস্থার কাছে জমা দিয়ে জানিয়েছিলেন যে তাঁর বন্ধু ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।"

"ম্যালেরিয়া?"

"হ্যাঁ।" গোরানসাহেব উঠে দাঁড়ালেন, "অর্জুন, চলো, একটু ঘুরে আসি।"

লনে পায়চারি করতে করতে গোরানসাহেব আচমকা দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর চোখ স্থির। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কী হল?"

"তুমি প্যাঁচাটাকে উড়ে যেতে দেখলে?"

"না তো। এখন তো আলো ফুটে গেছে। এ-সময় প্যাঁচা উড়বে কেন?"

গোরানসাহেব দ্রুত বাড়ির পেছনদিকে চলে যেতে অর্জুন অনুসরণ করল। না, কোথাও কোনও প্যাঁচা নেই, কিন্তু স্টিভেনসনের কবরে ঢোকার গর্তটা কেউ সযত্নে বন্ধ করে দিয়েছে।

(ক্রমশ)

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

চিঠি

সিদ্ধেশ

বড়দিদা এক বিচিত্র মানুষ। সবসময় কিছু-না-কিছু খুটুর-মুটুর করেই যাচ্ছেন। বিছানায় মাথার কাছে মহাভারত রেখে কাগজ-কলম নিয়ে কী জানি কী-কী সব লেখালিখি করেন। কখনও-বা আবার হাতে কলম নিয়ে তন্দ্রায় ঢুলে পড়েন। মাথার কাছে রামায়ণ-মহাভারতের পাতা ফরফর করে। সামনেই দেওয়াল ঘেঁসে তাঁর ঠাকুর দেবতারা সব তাঁরই দিকে অপলক তাকিয়ে থাকেন। দেখা ছাড়া তাঁর কী করার আছে? দোতলার খোলা জানালা দিয়ে হাওয়ার ঝাপট আসতে ঠাকুরের গায়ের ঢাকা যেমন সরে যায়, দিদার গায়ের আঁচলও খসে গিয়ে মেঝেতে লুটোয়। সকাল-সন্ধে ধূপ-ধুনোর গন্ধে ছোট্ট এই ঘর সবসময় ম-ম করতে থাকে। একধারে পড়ে থাকা বাক্সটি অনেক কাগজপত্রে ঠাসা। যখন বড়দিদা ঘরে একা থাকেন, তখন বাইরে থেকে বাক্সটি খোলা-বন্ধ করার আওয়াজ শোনা যায়। বারবার খোলা ও বন্ধ করায় বাক্সের কবজা খারাপ হয়ে গেছে। দিদা কাগজঠাসা বাক্সের ভেতর হাত ঢুকিয়ে কী যেন খোঁজেন। ওঁর শোয়ার খাটটিতে লেখাপড়ার সব সাজসরঞ্জাম মজুত। তাঁকে অন্য কোনও কাজও করতে দেয় না তাঁর দুই মেয়ে।

বড়দিদা নব্বই বছর পার করে দিয়েছেন। কিন্তু বুড়ো হয়েও এই শরীরে যে স্ফূর্তি, কমবয়সীরা তার সামনে ম্লান। কখনও এখানে, কখনও ওখানে। কখনও জানালার গ্রিলে মুখ লাগিয়ে দূর পর্যন্ত প্রসারিত তাঁর দৃষ্টি, জানি না কতদূর পর্যন্ত দেখতে পান। টুকটুক করে এদিক-ওদিক তাকানো, কখনও সামনের খোলা জায়গায় নতুন গজিয়ে ওঠা ফ্ল্যাটগুলোর দিকে, কখনও-বা দৌড়ঝাঁপ করা চঞ্চল শিশুদের দিকে। কিছুদিন হল দুটি অবিবাহিত মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এই নতুন ফ্ল্যাটে এসেছেন। মেয়েদের বয়সও হয়েছে, তারা আর বিয়ে করতে রাজি নয়, নিজেরা নিজেদের চাকরি নিয়েই ব্যস্ত। সকাল দশটা থেকে রাত সাতটা-আটটা পর্যন্ত একলা। দেখাশোনা করার জন্য একজন বয়স্ক মহিলা আছেন। তাঁরও বয়স অনেক, মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে সময়ের প্রতীক্ষা। সারাদিনের জন্য বাড়িতে দু'-দু'জন বৃদ্ধা। সুখে-দুঃখে নিজের নিজের জগতে আত্মমগ্ন দুই বৃদ্ধা। কী জানি কবে বুড়ি-মা নিজের গ্রামে ফিরে যান, বড়দিদা সবসময় এই চিন্তায় ডুবে থাকেন।

আসলে পরিপূর্ণ পরিবার। ন'টি কন্যা ও দুটি পুত্রসন্তানের জননী বড়দিদা। তাদের মধ্যে সাত মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, তাদের সব নিজের নিজের ঘরসংসার। দুই বড় ছেলের মধ্যে ছোট রাজন শহরের অন্য প্রান্তে বউ নিয়ে থাকে সুখে-শান্তিতে। বড় ছেলে অন্য জায়গায় আলাদা থাকে। বিদেশিনী বিয়ে করে ভারতে এসে অন্য প্রদেশে দুটি পুত্রসন্তান নিয়ে বসবাস করে। তাদের বড় ছেলে বিদেশে প্রতিষ্ঠিত, ছোট মা-বাবার সঙ্গে থাকে। মেয়েদেরও ছেলেমেয়ে। সেই ছেলেমেয়েদেরও ছেলে। সংখ্যায় ডজনখানেক। কিন্তু
বড়দিদাকে দেখতে আসে কতজন? বড়দিদা মানে নিরুপমা দেবী কত কষ্টে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়েছেন, মানুষ করেছেন। এই দুটি মেয়ে ছেড়ে সবাই নিজের নিজের জগতের হর্তা-কর্তা। স্বামীর উপার্জন বেশি ছিল না, তাতেই হেসেখেলে যেমন-তেমন ভাবে দিন কাটিয়ে এসেছেন।

স্বামী অবসর নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিরবিদায় নেন নিরুপমা দেবীর ঘাড়ে সব দায়িত্ব দিয়ে। কিন্তু বড়দিদা ছিলেন শক্তপোক্ত দৃঢ় মনের মানুষ। শক্ত জমি, আত্মবিশ্বাসে দৃপ্ত ব্যক্তিত্ব, কোনওদিন একচুল এদিক-ওদিক হননি, নিজের দায়িত্ব পুরো পালন করে এসেছেন। স্বামীর জীবিত অবস্থায় নিজের গয়না বিক্রি করে বড় ছেলে দেবেনকে বিদেশে যাওয়ার অর্থ জোগাড় করে দেন। মনে এই আশা ছিল, ছেলে দেশে ফিরে পরিবারের হাল ধরবে। এসব নিয়ে তাঁর মনে এখন আর কোনও ক্ষোভ নেই। মর্জিমাফিক দেশে ফিরে এলেও অনেক দূরেই থেকে গিয়েছে। কখনও-কখনও মোচড় দিয়ে ওঠা ব্যথা বুকের ভেতর নড়াচড়া করে। বড়দিদা কী জানি কী দিয়ে তৈরি, বিধাতা তাঁকে সবসময় কাঠপুতুলের মতো নাচিয়ে গেছেন এবং তিনি জীবনভর নেচে চলেছেন। এখন তো শুধু দুটি অবিবাহিত মেয়ের র চিন্তা, যারা তাঁর এতখানি বয়স পর্যন্ত তাঁকে সঙ্গ দিয়ে চলেছে।

নিরুপমার মনের গভীরে এসব হুলের মতো বিঁধতে থাকে। মহাভারত পড়ে, রামায়ণ পাঠ করে সবকিছু হালকা হয়ে যায়। লেখাপড়ার শখ সেই ছেলেবেলা থেকে। ডায়েরি ভরে এখন হয়তো কিছু গানের লাইন লেখা হয়, কখনও রামের বনবাস বা পাণ্ডবদের পরাক্রমের গল্প শোনান নাতি-নাতনিদের। কখনও-সখনও পূজাপার্বণের ছুটিতে সকলে একজোট হলে নিরুপমা বেশ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। একমাত্র সমুই নাতির ছেলে, যে সকলের চেয়ে ছোট। কোনওদিন একদিনের জন্য সমু থাকলে তাঁর নিজের শৈশব মনে পড়ে যায়। নব্বই বছরের বড়দিদা তখন ন' বছরের পুতুল হয়ে যান। সমু দুষ্টু, চঞ্চল। হাতে পান না। ডাকেন, "বাবলু, আমার কাছে আয়, গল্প শোনাব। এই দেখ আমার

কাগজ কমল, পড়ে শোনাব, আয়।"

"না, কমিক্স শোনাবে, তবে যাব!"

মহাভারত রামায়ণের জগতে সর্বদা ঘুরে বেড়ানো বড়দিদা কী করে জানবেন স্পাইডারম্যান, সুপারম্যানদের খবর। সমু হাত ফসকে পালিয়ে গেলে বড়দিদা ফোকলা মুখে হাসতে থাকেন।

একবার বড়দিদা অসুস্থ হয়ে পড়লে পুরো পরিবার একটি ঘরেই মৌমাছির মতো ভনভন করতে থাকে। এই বুঝি দিদা গেলেন,এখন-তখন অবস্থা। ডাক্তার তো জবাবই দিয়ে দিয়েছিলেন, "কিছু করার নেই। ওষুধ আর কত সাহায্য করবে? এ তো বয়সের দোষ, তবুও যতটা করা যায়। দেখুন না ই.সি.জি-র রিপোর্ট, রেখাগুলো ওপর-নীচে ওঠানামা করছে।"

ছেলে রাজন, বউ, মেয়েরা, তাদের ছেলেমেয়ে,সকলেই তটস্থ। দিন গোনা, তারপর ঘণ্টা, তারপর মিনিটে এসে দাঁড়িয়েছে।

নিরুপমা বিছানায় শুয়ে-শুয়ে ছটফট করছিলেন। কখনও অজ্ঞান হয়ে পড়ছিলেন। জ্ঞান হলে আবোলতাবোল বকছিলেন, মাথার কাছ থেকে রামায়ণ মহাভারত সরিয়ে রাখা হয়েছিল। বিছানার ওপর কিছুই ছিল না। কাগজ কলমও না। সবকিছু বাক্সবন্দি এখন। কিছুদিন আগেই ওঁর মেজো মেয়ে মারা যায়। এতে তিনি খুব ব্যথা পান। তাঁরই প্রাণাধিক সন্তান তাঁরই সামনে দিয়ে চলে যাবে, এটা যেন কোনওভাবে মেনে নেওয়া যায় না। মর্মাহত বড়দিদা শোকে অভিভূত হয়ে কবিতা লিখে ফেলেন। সেসবও বাক্সে তুলে রাখা হয়েছে। ছোটবউ দিনরাত জেগে সেবা করে যাচ্ছে। বড়দিদার শরীর এখন শুধু হাড়ের খাঁচা। ওঁর দিকে ঝুঁকে ছোটবউ জিজ্ঞেস করছে, "মা, এখন কী কষ্ট হচ্ছে?" কী বলবেন? কোথায় কোথায় তাঁর যন্ত্রণা। সব কি বলা যায়! শরীরের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে জ্বালা, আগুনে পুড়ে বুক তো জ্বলে কয়লা হয়ে গেছে। বড় ছেলে খবর শুনেও এল না। টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। কত আশা ছিল বড় ছেলেকে ঘিরে। কত যত্ন করে বিদেশ পাঠানো হয়েছিল যে, ওখান থেকে এসে মাকে দেখবে, বোনদের সুখ-দুঃখের ভাগিদার হবে। পুরো সঞ্চিত অর্থ তারই জন্য খরচ করা হয়। ও'ও একলাই পড়ে আছে এখন। তার ছোট ছেলে ওঁর সঙ্গে রয়েছে, সেও তো উড়নচণ্ডীর মতো এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়। সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এ-জীবনের অর্থ কী? বিদেশিনী বউ কঠিন অসুখে আক্রান্ত হয়ে অনেকদিন হল গত হয়েছে। নিরুপমা ভেবেছিলেন, এবার হয়তো তাঁর কাছে ফিরে আসবে। ছেলের তো প্রায় সত্তরের কাছাকাছি বয়স হল। নিরুপমা শুনেছেন, ছেলে চোখে ভাল দেখে না। এখান থেকে দূরে ফ্ল্যাট কিনেছে। কী হবে ফ্ল্যাট দিয়ে, অর্থ দিয়ে, যদি কারও সঙ্গে মিলেমিশে থাকতেই না পারে। নিরুপমা কোনওদিন ওখানে যাননি। ছেলে একবার মাত্র এসেছিল। বিদেশিনী বউ কয়েকবার এসেছে। বউ খুব মিশুকে ছিল। সকলের সঙ্গে মিলেমিশে গিয়েছিল। মনে হয়নি সাত-সমুদ্রপারের কেউ।

নিরুপমা এসব ভেবে মনে-মনে খুব বেদনাবোধ করেন। তাঁর দুঃখের কথা কেউ জানতেও পারে না। নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দেন। যেখানেই থাকো সুখে থাকো। আজ জীবনের অন্তিম কিনারে এসে ওর কথা খুবই মনে পড়ে। কাউকে কিছু বলেন না।

এখানে ও ছাড়া সকলেই ছিল। এতবড় ভরপুর সংসার, মেয়েরা, তাদের ছেলেমেয়েরা, ছোটও কাছেই অন্য শহরে থাকে। ছোটবউ তো সবসময় খবর নেয়। এখন তো ওই ভরসা। মারা গেলে যাবতীয় কাজ করার জন্য ছোটই আছে। সোমু, তাঁর বাবলু কাছেই ছিল। মেয়ের ছেলের ছেলে। খুব চঞ্চল। সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল, কিছু ভাবছিল যেন। বড়দিদা বিছানা আঁকড়ে পড়ে ছিলেন। এখন মৃত্যুর প্রতীক্ষা। পাঁচদিন কেটে গেছে, একই অবস্থা। বড়ছেলেকে টেলিগ্রাম করা হয়েছে। সে আসেনি।

সময় কাটতে দেরি হয় না। সপ্তম দিনে অদ্ভুতভাবে ভাল হয়ে উঠলেন বড়দিদা। সোমু এই বলেই ডাকে তাঁকে। সোমুকে পেয়ে বড়দিদা খুবই খুশি, বড়ছেলের অভাব সোমুকে দেখে দেখে যেন পূরণ করে নিচ্ছিলেন বড়দিদা। মেয়েরা আশ্চর্য হয়ে ভাবছিল তাদের মা কী দিয়ে তৈরি। মাকে ভাল দেখে যে যার নিজের সংসারে

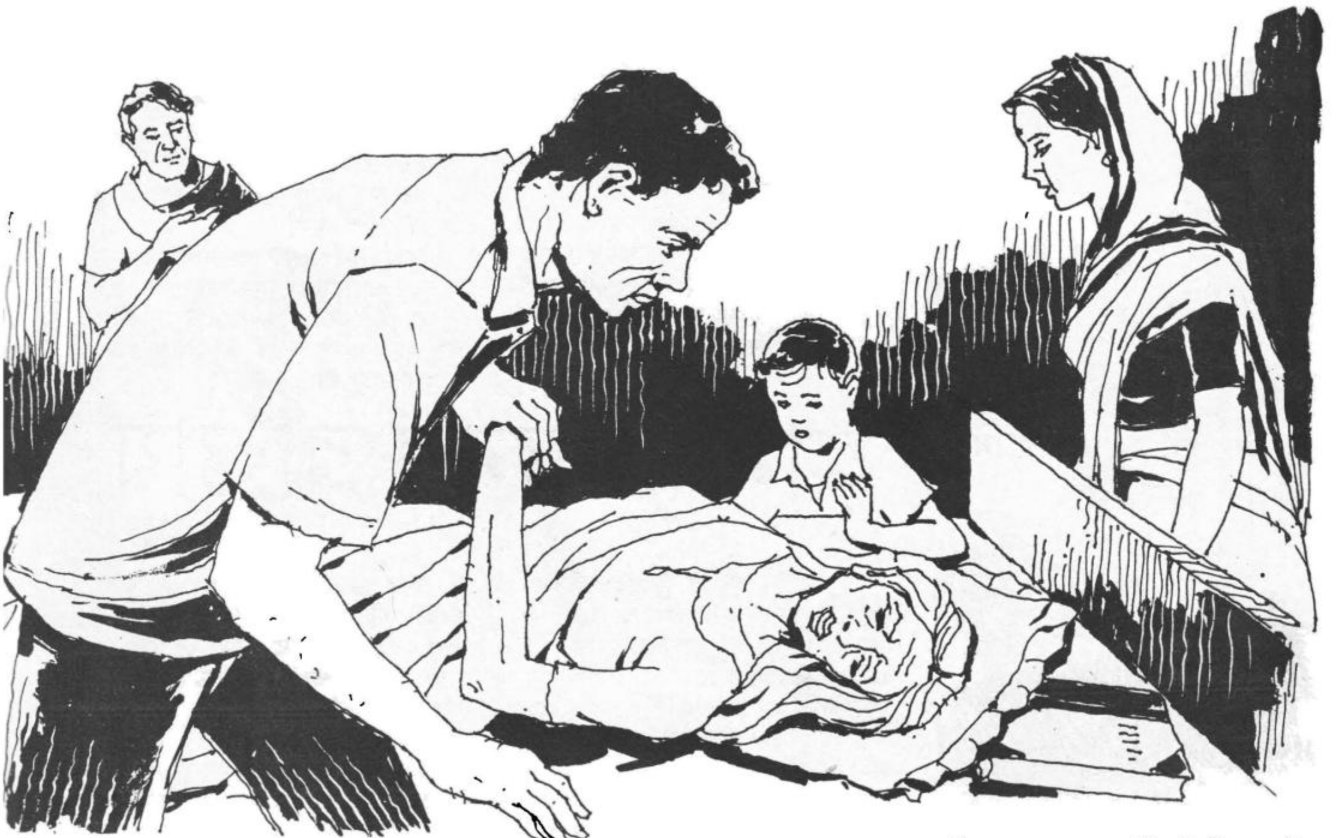

ফেরার তোড়জোড় লাগায়।

বড়মেয়ে বলছিল, "এটা কিন্তু ভাল লক্ষণ নয়।"

অন্যজন বলল, "প্রদীপ নেভার আগে যেমন জ্বলে ওঠে, মনে হচ্ছে লক্ষণটা তেমনই।"

আরেকজন হেসে বলল, "না, না, বড়দার জন্য মার প্রাণ আটকে আছে। মৃত্যু এসেও ফিরে গেছে।"

"কিন্তু বড়দাদার তো আসার কোনও আশাই নেই। অপরাধীর মতো মুখ লুকিয়ে বসে আছে।"

"না রে, ও সকলের সামনে আসতে পারছে না। এটা কি ওর কম দুঃখ," বড় সহানুভূতির সঙ্গে বলল।

আট-দশদিন পর নিরুপমা আবার বিছানা ছেড়ে উঠলেন। একাই বাথরুমে যেতে লাগলেন। নিজের হাতে খাবার খেলেন। সোমু ওকে দেখবার জন্য রয়ে গেল। স্কুলের ছুটি ছিল। বড়দিদা ওকে যেতে দেননি। সবাই ভাবল, থাক, মার ভাল লাগবে। আবার রামায়ণ, মহাভারত, গীতা বাক্সমুক্ত করে নিজের বিছানায় রেখেছেন। বাক্স খোলার খুটখাট আওয়াজ শুরু হয়ে যায়। কাছে-থাকা দুই মেয়ে কাজে বেরিয়ে যায়। বড়দিদার কিছুতেই মন লাগে না। জানালার শার্শিতে মুখ লাগিয়ে বসে থাকেন। বাইরে তাকালেই ওইসব মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা ফ্ল্যাট। বড়-বড় ক্রেনের আওয়াজ সবসময়। বুক ধড়ফড় করে। নিশ্চিন্তে বুড়িমা পাশের ঘরে পা ছড়িয়ে বসে ঢুলতে থাকেন।

হঠাৎই তাঁর মনে হল ওরকমই লম্বা, টাই-কোট পরা কোনও লোক দূর থেকে যেন তাঁদের ফ্ল্যাটের দিকে এগিয়ে আসছে। ওরকমই হেলেদুলে চলা, হাতে সুটকেস, লম্বা-লম্বা পা ফেলা। যখন তাকে বিদেশে পাঠানো হল, ঠিক এরকমই ব্যাপারস্যাপার ছিল। চোখ বড়-বড় করে আবছা দৃষ্টিতে এগিয়ে আসা মানুষটিকেই দেখছিলেন। ওঁর মনে হচ্ছিল হয়তো খাট থেকে মেঝেতে পড়ে যাবেন। হাত-পা কাঁপতে থাকে। জানলার শিক ধরে-ধরে বিছানায় বসে পড়লেন। অনেক মুহূর্ত পার হয়ে গেল, আধঘণ্টা পর্যন্ত অমনি বসে রইলেন, কিন্তু কেউ এসে দরজায় খটখট করল না। ডোর-বেলও বাজল না। বড়দিদা হতাশ হয়ে ধীরে-ধীরে নিজের বাক্সের কাছে এলেন। অনেক খুঁজেপেতে বড়ছেলের ছেলেবেলার একটি ফোটো বের করলেন। ফোটোতে কেমন জবুথবু দাঁড়িয়ে ছিল, পরনে হাফপ্যান্ট ও ডোরাকাটা শার্ট। এখন তো সত্তর বছর বয়স। সেবার যখন এসেছিল তখন বোধ হয় ওর বয়স ছিল ষাট। চোখে চশমা, রোগাপাতলা, ফুলপ্যান্ট ও শার্টের ওপর লম্বা টাই। বিদেশে থেকে এসব আয়ত্ত করে নিয়েছে। জানি না হৃদয় নামে বস্তু হয়তো ওখানেই ছেড়ে এসেছে।

নিরুপমা কাগজ-কলম নিয়ে তৈরি। কলমটা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। ডাক দিলেন, "সোমু, একটু দেখ'তো বাবা কলমটা কোথায়? দিয়ে যা তো ভাই। কোথায় রাখলি তখন, টেবিলের ওপর তো পাচ্ছি না। দিয়ে যা না খুঁজে।"

সোমু এখন কলম দিয়ে লিখতে শিখেছে। কারও সঙ্গে হয়তো কাটাকুটি খেলেছে। কোথায় রেখে দিয়েছে কলম। ভীষণ ভুলো মন ওর।

সোমু বাইরের ঘরে টিভি'র চ্যানেল ঘুরিয়ে যাচ্ছে। সেখান থেকেই জবাব এল, "কী হল, কেন ডাকছ? এখন আমি আসতে পারব না।"

"কেন রে, আয় না একটু, কলমটা দিয়ে যা।" কাগজ হাতে নিয়ে তিনি বসে ছিলেন। আঙুলের মাঝামাঝি কাগজ কাঁপছে। কোনওমতে উঠে টেবিলের কাছে এলেন, টেবিল হাতড়াতে লাগলেন। ঠিক করে দেখতেও পারছেন না। চোখের দুই কোলে জল টলটল করছে।

কোনওমতে কলমটা পেয়ে গেলেন। বিছানা পর্যন্ত এলেন। এখন আর কিছু লেখার সাহস পান না। হাতের কাঁপুনি বেড়ে যায়। আঙুলগুলো যেন বেঁকে যায়। মন বিষাদে ভরে ওঠে। কোনওরকমে কলম ধরে আঁকাবাঁকা অক্ষরে ছেলেকে একটা চিঠি লেখার চেষ্টা করতে লাগলেন।

ঠিক সেই সময় ডোর-বেল ঝনঝন করে বেজে উঠল।

ছবি: নির্মলেন্দু মণ্ডল

আমবাগানের রাস্তায়

গৌর মিত্র

ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরে বইপত্র রেখেই সোজা কালকাসুন্দের মাঠ। এটাই শুভর রোজকার রুটিন। মাঠে একদিন না গেলে ওর মন কেমন করে। হেরফের অবশ্য ঘটে, কখনও-কচিৎ। সেবার গরমের ছুটিতে এক সপ্তাহের জন্য শ্রীরামপুরে মামার বাড়ি গিয়ে শেষমেশ দু'দিন পরই মামার কোলে চেপে বাড়ি। এই নিয়ে হাসাহাসি কম হয়নি, কিন্তু তাতে দমেনি শুভ। ওর রাঙা-কাকিমাই একমাত্র বুঝতে পেরেছিলেন, আসল ব্যাপার কী। তা হল রাতে মায়ের পাশে না ঘুমোলে কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে, শুভর ঘুম হয় না। কিন্তু সেটা ওর সামনে বলা চলবে না, কারণ সে নাকি এখন বড় হয়েছে।

কিন্তু সেদিন শুভর যে কী হয়েছে, ইস্কুল থেকে ফিরে সেই যে কাকিমার ঘরের রাস্তার দিকের জানালার গ্রিল ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে একেবারে বিকেল গড়িয়ে সন্ধে। রাঙাকাকিমা, মা সকলেই মুখ চাওয়াচাওয়ি, ফিসফাস করেছেন। কিন্তু ওই পর্যন্তই। শুভর কোনও তাপ-উত্তাপ নেই। এমনকী,বিকেলে খাওয়ার ব্যাপারেও কোনও উচ্চবাচ্য নেই। ব্যাপারটা ভাল লাগে না রাঙাকাকিমা চামেলির। তিনি ঠাকুরঘরে প্রদীপ জ্বালাতে গিয়েও লক্ষ করেন শুভ ঠায় একভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলের হাবভাবে উদ্বিগ্ন মা সবিতা ওর পাশে এসে জিজ্ঞেস করেন, "কী রে শুভ, চুপচাপ কেন? বন্ধুদের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বুঝি?"

শুভ আমতা আমতা করে, "কই, না তো!"

"তবে তুই যে আজ মাঠে গেলি না?"

এতক্ষণ পর জানালার পাশ থেকে সরে গিয়ে নিজের একমাথা কুচকুচে কোঁকড়া চুলে আঙুল চালাতে চালাতে শুভ বলল, "বললাম তো কিছু না।" মা কথা না বাড়িয়ে রান্নাঘরে ঢুকলেন।

সন্ধে হয়েছে অনেকক্ষণ। আফিস থেকে সকলের বাড়ি ফেরার সময় হয়ে আসছে। সুতরাং জলখাবার, রাতের রান্না সবই সবিতাকেই করতে হবে। চামেলি অবশ্য শুভর পড়াশোনার দিকটা সামলান। শুভ এ-বাড়ির সকলেরই খুব আদরের। চামেলির কাছেও সে কম আবদার করে না। আসলে শুভ রাঙাকাকিমার ন্যাওটা, সুতরাং তার সব ঝক্কি-ঝামেলা চামেলিই সামলান। কিন্তু আজ সব ব্যাপারই ওলটপুরাণের মতো। যে শুভ কোনওদিন রান্নাঘরে ঢোকে না, সে আজ মায়ের পিছু-পিছু রান্নাঘরে! চামেলি খাবারের ডিশ হাতে শুভকে ডাকতে হঠাৎ সে চমকে ওঠে।

"কী শুভবাবু, সেই বিকেল থেকে মনখারাপ করে ঘুরছ, ব্যাপারটা কী?"

শুভর সেই এক উত্তর, "বললাম তো, কিছু না।"

"তা হলে এসো, খাবারটুকু খেয়ে নাও!"

"না, এখন আমার খেতে ইচ্ছে করছে না।"

"তাই বললে হয় কখনও? সময়মতো খাওয়াদাওয়া না করলে শরীর খারাপ করবে। যা বলছি শোনো। খেয়ে নাও।"

শুভ হঠাৎ বিরক্ত হয়ে বলে,, "বললাম তো খেতে ইচ্ছে করছে না।"

এবার চামেলি কপট রাগ দেখিয়ে বলে ওঠেন, "ঠিক আছে। তোমার রাঙাকাকা আগে ফিরুন, আমি ওঁকে সঙ্গে নিয়ে তোমার বন্ধুদের বাড়ি যাব। তা হলেই বুঝতে পারব তোমার ব্যাপারস্যাপার কী।"

এবার খানিকটা দমে যায় শুভ। রান্নাঘরের দরজা পেরিয়ে কাকিমার ঘরে খাটের কোনায় বসে খাবারের ডিশ হাতে নেয়। খুব অনিচ্ছার সঙ্গে একটুখানি খাবার মুখে দিয়ে কেমন যেন মুখ বাঁকায়। ব্যাপারটা ভাল মনে হয় না চামেলির। তিনি ভাবেন শুভর বোধ হয় নজর লেগেছে। ওর সুন্দর চেহারা দেখে সবাই এমন মুখে মুখে বলতে থাকে, গা-পিত্তি জ্বলে যায়। আর এসব কারণেই আগেও দু-একবার এমন হয়েছে। জ্যোতিষী, তাবিজমাদুলি, শেকড়বাকড় করে তবে রেহাই। সুতরাং আজও সেরকমই মনে হয় চামেলির। কথা না বাড়িয়ে শুভকে খাটে শুইয়ে দিতেই একটা অদ্ভুত অস্বস্তি শুরু। অধীর হয়ে ওঠেন। তাড়াতাড়ি সবিতাকে ডেকে বিষয়টার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন এবং ঠিক হয়, কর্তারা অফিস থেকে ফিরলেই মোহন গনৎকারকে একবার ধরে আনতে হবে। শুভ মা আর কাকিমার কথাবার্তা সবই শুনতে পাচ্ছে আর বারবার বলছে, "ধুত, বলছি কিছু হয়নি, শুধু শুধু তোমরা আমাকে নিয়ে ঝামেলা করছ।"

সাধারণত ছেলের ব্যাপারে মাথা ঘামান না সবিতা, কারণ ওসব চামেলি দেখেন, কিন্তু আজ আর সামলাতে পারেন না নিজেকে। বেশ ধমকের সুরেই বলেন, "দ্যাখ শুভ,তোর বড্ড সাহস বেড়েছে। তখন থেকে একই কথা বলছিস। নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। হয় ইস্কুলে বকা খেয়েছিস, নয়তো বন্ধুদের সঙ্গে ঝগড়া-ঝামেলা করেছিস। তুই একদিন মাঠে না গেলে সারা বাড়ি মাথায় তুলিস, আর আজ কি না..." কথা শেষ হতে-না-হতেই চামেলি সবিতাকে বুঝিয়েসুজিয়ে ঠাণ্ডা করেন। শুভ থম মেরে খাটে শুয়ে থাকে।

কিছুক্ষণ পরই দু'ভাই হরনাথ আর গৌরীনাথ বাড়ি ফেরেন। শুভর বাবা হরনাথ ব্যাঙ্কে আর কাকা গৌরীনাথ কোর্টে চাকরি করেন। কর্তাদের

চা-পর্ব শেষ হতেই চামেলি প্রথম কথাটা পাড়েন। সব শোনার পর গৌরীনাথের সহাস্য মন্তব্য, "তোমাদের সব ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি। আরে,ওসব কিছু না। মনে হয় বন্ধুদের সঙ্গে মান-অভিমানের ব্যাপার। এর থেকেই শরীর খারাপ। ওসব ছাড়ো, ওকে বরং রাতে আর ডেকো না, ভাল করে ঘুমোলে কাল সকালেই দেখবে একেবারে ফিট।"

ব্যাপারটা তাই-ই হল। পরদিন সকালে শুভ সত্যিই ফিট। এবং যথারীতি চান-খাওয়া সেরে স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি। চামেলির ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু শুভর জেদের কাছে হার মানতে হল। আজ আর বন্ধুরা আসেনি, সুতরাং কাকার সাইকেলে চেপে সোজা ইস্কুল। টিফিনে ময়ূখ, শুকু, বাপ্পার অনুযোগ, "শুভ, তুই কেন কাল মাঠে এলি না? মিহিরদা আমাদের খেলতে নেয়নি। তুই আর অর্ণব থাকলে পারত মিহিরদা আমাদের মাঠের বাইরে রাখতে?"

শুভকে নিরুত্তর থাকতে দেখে শুকু বলে, "কী রে, আসবি তো আজ?"

শুভ এতক্ষণ আনমনে কী একটা ভাবছিল, শুকুর কথা কানেই নেয়নি সে। শুধু স্কুলের সামনের রাস্তাটায়, যতদূর চোখ যায় নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে। কী যেন খুঁজছে মনে মনে। ওর চাউনিতে কেমন যেন একটা শূন্যতা।

"কী রে শুভ, কী ভাবছিস?" ময়ূখের কথায় চমকে ওঠে শুভ। ঘাড় ঘুরিয়ে বলে, "কী যেন বলছিস?"

"আজ মাঠে আসছিস তো?"

শুভ আনমনে উত্তর দেয়, "হ্যাঁ।"

টিফিন পিরিয়ড শেষ। সবাই ক্লাসে যায়। বাংলার সার ক্লাস নিচ্ছেন কিন্তু মন নেই শুভর, সে শুধু বারবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকাচ্ছে। এক-এক করে বাকি চার পিরিয়ডও শেষ। ছুটির ঘণ্টা পড়তেই শুভ বন্ধুদের সঙ্গে বাড়ির রাস্তা ধরে। একটু করে হাঁটছে আর চারদিক তাকাচ্ছে। বাড়ির কাছাকাছি আসতেই ভাবে, যাক, তাকে দেখা যায়নি। বাঁচা গেল। বাড়ি পৌঁছে বইয়ের ব্যাগ রেখেই চেঁচামেচি, "কাকিমণি, মা, মাঠে যাচ্ছি।" বলেই এক ছুটে বাড়ির বাইরে। এতক্ষণে চামেলির মুখে হাসি। যাক, শুভ এবার তা হলে সত্যিই ফিট!

একে একে সবাই মাঠে এসে গেছে। গোলপোস্টের পাশে ময়ূখ অর্ণবদের জটলা। শুভও ওদের সঙ্গে আছে। তবে মাঝেমধ্যে দল ভাগাভাগি পর্ব শেষ। সবাই মাঠে নামবে, হঠাৎ শুভর নজরে পড়ে দূরে চাটুজ্যেদের আমবাগানের কোলঘেঁষা শানবাঁধানো পুকুরঘাটের চাতালে। মুহূর্তে সারা শরীর যেন হিম। কোনওরকমে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে সোজা বাড়ি। অসময়ে এভাবে শুভকে বাড়ি ফিরতে দেখে ছুটে আসেন চামেলি। উদ্বিগ্ন শুভকে জড়িয়ে ধরে বলেন, "কী হয়েছে বাবা? হাঁপাচ্ছিস কেন? মাঠে বুঝি গোলমাল হয়েছে?"

কাকিমার বুক থেকে মাথা সরিয়ে শুকনো গলায় শুভ বলে, "না, ও কিছু না।" চামেলি লক্ষ করেন শুভর চোখদুটো লাল, সমস্ত শরীর ঘামে জবজব করছে। ওর বুকের মধ্যে ওঠা-নামার লয় দ্রুত। চামেলি ঘরের সিলিং ফ্যানের সুইচ অন করে শুভকে খাটে বসান। ফ্যানের হাওয়ায় এখন অনেকটাই স্বাভাবিক। এক গ্লাস জল এনে শুভকে খেতে দেন। ঢক ঢক করে সব জলটুকু খেয়ে শুভ এখন শান্ত। চামেলি আবার জিজ্ঞেস করেন, "কী শুভ, কিছু বলছ না কেন?" শুভ নিরুত্তর। ওর দৃষ্টি শুভ বাইরের দিকে।

সবিতা গিয়েছিলেন পাশের বাড়ি সোয়েটারের ডিজাইন আনতে, ফিরে এসে চামেলির মুখে সব শুনে রীতিমত বিহ্বল হয়ে উঠলেন। শুভকে কিছু জিজ্ঞেস করতে যাওয়ার মুখেই চামেলি ইশারায় ওঁকে থামিয়ে দেন। শুভ এখনও নির্বাক। চামেলি আর এ ব্যাপারে জোরাজুরি করেন না। রাতেও এসব নিয়ে কেউ আর শুভকে বিব্রত করে না। পড়াশোনার শেষে কাকিমার হাতে সামান্য খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ে শুভ। ব্যাপারটা অজানাই থেকে যায়।

পরদিন সকালে উঠে অন্যদিনের মতো কাকিমার কাছে পড়তে বসে। আচরণে কোনও

অস্বাভাবিকতা নজরে পড়ে না চামেলির। যথারীতি চান-খাওয়া শেষে বন্ধুদের সঙ্গে ইস্কুলে বেরিয়ে যায়। চামেলির ইচ্ছে ছিল একবার স্কুল পর্যন্ত বেরিয়ে যাওয়ার, কিন্তু শুভর আপত্তি, "কাকিমণি, তুমি না কী? আমি এখন বড় হয়েছি না? তা ছাড়া সব বন্ধুদের সঙ্গেই তো যাচ্ছি।" শুভর কথায় আশ্বস্ত চামেলি দরজা অবধি এগিয়ে এসে হাত নাড়েন।

বাড়ি থেকে সোজা রাস্তায় স্কুল যেতে মিনিট কুড়ি সময় লাগে, অবশ্য চাটুজ্যেদের আমবাগানের পথ দিয়ে গেলে দশ মিনিট। ওরা সবাই সদর রাস্তা ধরেই স্কুলে যায়। শুভ দু'চার পা হাঁটে আর মাঝে-মাঝেই এদিক-সেদিক তাকায়। স্কুলের কাছাকাছি এসে নিশ্চিন্ত। মনে মনে ভাবে, ধুত, শুধু-শুধু ভয়। কিসের ভয়? সবাই একসঙ্গে আছে ওরা। নিজের মনেই নিজেকে সান্ত্বনা দিতে দিতেই স্কুল পৌঁছে যায়। সারাদিন বেশ ভালই কাটে শুভর। আজ অঙ্কের মাস্টারমশাই আসেননি, তাই ইতিহাসের সার ক্লাসে এসে পুরু আর আলেকজান্ডারের গল্প শুনিয়েছেন। পুরুর বীরত্বের কাহিনী শুনে শুভ বেশ খুশি। ওরও ইচ্ছে হয় পুরুর মতো সাহসী হতে। এসব ভাবতে ভাবতেই ছুটির ঘণ্টা। সবাই একসঙ্গে হুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়ে।

ময়ূখ বলে, "শুভ, আজ কিন্তু দেরি করিস না। বালক সঙ্ঘের সঙ্গে ম্যাচ আছে। চল চাটুজ্যেজেঠুদের আমবাগান দিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি যাই।" রাজি হয় সবাই। সত্যিই তো, অল্প রাস্তা, তাড়াতাড়ি পৌঁছনো যাবে। ওরা সব গল্পে গল্পে মশগুল। শুভ ওদের সঙ্গে হাঁটছে আর মাঝে-মাঝেই এদিক-ওদিক দেখছে। এভাবে একটু সামনে এগিয়ে যায় বন্ধুরা, শুভ পেছনে পড়ে যায়। হঠাৎ দূরে বড় আমগাছটার সামনে সেদিনের দৃশ্য। শুভ থমকে দাঁড়ায়। ওর সারা শরীর মুহূর্তে হিম। মুখ দিয়ে কথা সরে না। বুকের মধ্যে তোলপাড়। ও দেখতে পায় বৃদ্ধাকে আমগাছের পাশ থেকে আলুথালু চুল, পরনে ময়লা সাদা কাপড়, অনেক জায়গায় ছেঁড়া, বড় বড় চোখ, হাসছে আর হাত তুলে ইশারায় ডাকছে। সে যখন হাসছে তার বড়বড় চোখ থেকে আগুন বেরিয়ে আসছে। শুভ নির্বাক। হঠাৎ ওর মামার কথা মনে পড়ে গেল। সেবার মামা ওকে রাতে রূপকথার রাজকুমার আর ডাইনি বুড়ির গল্প শুনিয়েছিলেন। ডাইনিরা নাকি ছেলেপুলেদের নানারকম খাবার, ফুল এসব দেখিয়ে ঝোলায় পুরে দূরদেশে নিয়ে চলে যায়। তা হলে এই বৃদ্ধা নিশ্চয়ই ডাইনি, নইলে কেনই বা একদিন ওর পিছু নিয়ে ডাকে আর হাসে? ভয় চেপে ধরে শুভকে। সমস্ত শরীর উত্তেজনায় কাঁপছে। বৃদ্ধা একটু একটু করে সামনে আসছে আর মিটিমিটি হাসছে। ওর হাতেও একটা ঠোঙা। তবে কি এবার শুভকে ধরবে? বৃদ্ধা এবার আরও কাছে। শুভ একেবারে ওর হাতের নাগালে। হঠাৎ শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে চিৎকার করে ওঠে, "ময়ূখ, ডাইনি...।"

হঠাৎ চিৎকারে থমকে যায় বৃদ্ধা। শুভর চিৎকারে পেছনে ফিরে দেখে সবাই একসঙ্গে ছুটে আসে। ওদের হ্যাঁচকা টানে মাটিতে পড়ে যায় বৃদ্ধা মুখ থুবড়ে। চিৎকার চেঁচামেচিতে আশপাশের লোকজন দৌড়ে আসে। অর্ণব এরই মধ্যে ছুটে গিয়ে শুভদের বাড়ি খবর দেয়। শুভর মা, কাকিমা এসে দেখেন, থুত্থুরে একটি বৃদ্ধা উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে আছে আর ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বাপ্পা বেশ বীরত্বের সঙ্গে বলে ওঠে, "ভাগ্যিস, শুভ চেঁচিয়েছিল, নইলে নির্ঘাত ডাইনি বুড়িটা ওকে ধরে নিয়ে যেত। খবর শুনে একটু দূরেই চাটুজ্যেবাড়ির বড়বাবু ছুটে এসে দেখেন এক বৃদ্ধা মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে গোঙাচ্ছেন, "ওগো, তোমরা আমার নাতিকে নিয়ে যেওনা, ওকে ছাড়া আমি বাঁচব না।"

এ-দৃশ্য দেখে শুভ নির্বাক পুতুলের মতো ওর কাকিমার পাশে এসে দাঁড়ায়। বৃদ্ধার কান্নায় অচিরেই পরিবেশটা গুমোট হয়ে যায়। চাটুজ্যেবাবু বৃদ্ধাকে পরম মমতায় উঠে বসিয়ে মুখের দিকে তাকিয়েই অবাক। বৃদ্ধার কপাল বেয়ে রক্তের স্রোত,দু'চোখে জলের ধারা। হাপুস নয়নে কাঁদছেন। শুভর ভীষণ মায়া হয়। হঠাৎ তার মনে পড়ে যায় বাপ্পার ঠাকুমার কথা। সেবার পুজোর সময় বাপ্পার যখন খুব জ্বর, ওর ঠাকুমা ওকে জড়িয়ে ধরে কাঁদত, আদর করত, ঠিক এই বৃদ্ধার মতো। কিন্তু ডাইনিরা কাঁদবে কেন? শুভর মনে প্রশ্ন। তারা তো যাদের ধরে নিয়ে যায় তারা কাঁদে, একথা মামার মুখেই শোনা। কিন্তু এই বৃদ্ধাকে তো বাপ্পার ঠাম্মার মতোই মনে হয়। এর মধ্যে চাটুজ্যেবাবু হঠাৎ যেন আবিষ্কারের আনন্দে লাফিয়ে ওঠেন। উপস্থিত সকলের উদ্দেশে বেশ গম্ভীর গলায় বলেন, "ছিঃ ছিঃ, কাজটা মোটেই ভাল হয়নি।"

শুকু কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তাকে বেশ একটা ধমক দিয়ে থামিয়ে বললেন, "এই তোমরা পড়াশোনা করো? একজন বয়স্ক মানুষকে তোমরা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে? তোমাদের লজ্জা করছে না? জানো ইনি কে?"

জনতা নড়েচড়ে ওঠে। শুভ আচ্ছন্নের মতো তাকিয়ে। এবার চাটুজ্যেবাবু আবার শুরু করেন। "আমাদের পাশের গ্রামের অচিন্ত্য মাস্টারমশাইয়ের একমাত্র ছেলে বুম্বা হঠাৎ জলে ডুবে মারা যায়, ইন্দু খুড়িমা তখন তীর্থ করতে পুরীতে। ফিরে এসে একমাত্র নাতির মৃত্যু-সংবাদে অমন হয়ে গেছেন। ডাক্তার-বদ্যি করে লাভ না-হওয়ায় শেষে মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কদিন আগেই খুড়িমা পালিয়ে এসে পথে পথে ঘুরছেন। অচিন্ত্য জানে না যে তার মা এই চত্বরেই। সে বেচারি যখন সব জানবে কী দুঃখটাই না পাবে! ছিঃ, এটা মোটেই উচিত হয়নি।"

শুভ ভাবে, সত্যিই তো, এটা ঠিক হয়নি। না বুঝে কী ভয়টাই না পেয়ে এমন সব কাণ্ড ঘটাল। সত্যিই কি ডাইনি বলে কিছু আছে? তা হলে তাদের দেখতে কেমন? তারাও কি আমাদের মতো মানুষ? ব্যথা লাগলে কাঁদে, কষ্ট পায়? না, না মানুষ তো মানুষই, তারা কি কখনও ডাইনি হয়। এসব ভাবতে ভাবতেই আড়াল থেকে বেরিয়ে একটু একটু করে বৃদ্ধার দিকে এগোয়। সবাইকে অবাক করে তাঁকে হাত ধরে মাটিতে দাঁড় করায়, মুখের দিকে চেয়ে শুভ বলে, "ও ঠাম্মা, এই তো আমি তোমার নাতি। আমার তো ঠাম্মা নেই, তুমিই আমার ঠাম্মা।"

মুহূর্তে যেন সংবিৎ ফিরে পান ইন্দু খুড়িমা, দু'হাতে বুকে টেনে নেন শুভকে। তাঁর দু' চোখে জলের ধারা। শুভকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকেন। শুভর চোখেও চিকচিক করছে জল।

ছবি : অনুপ রায়

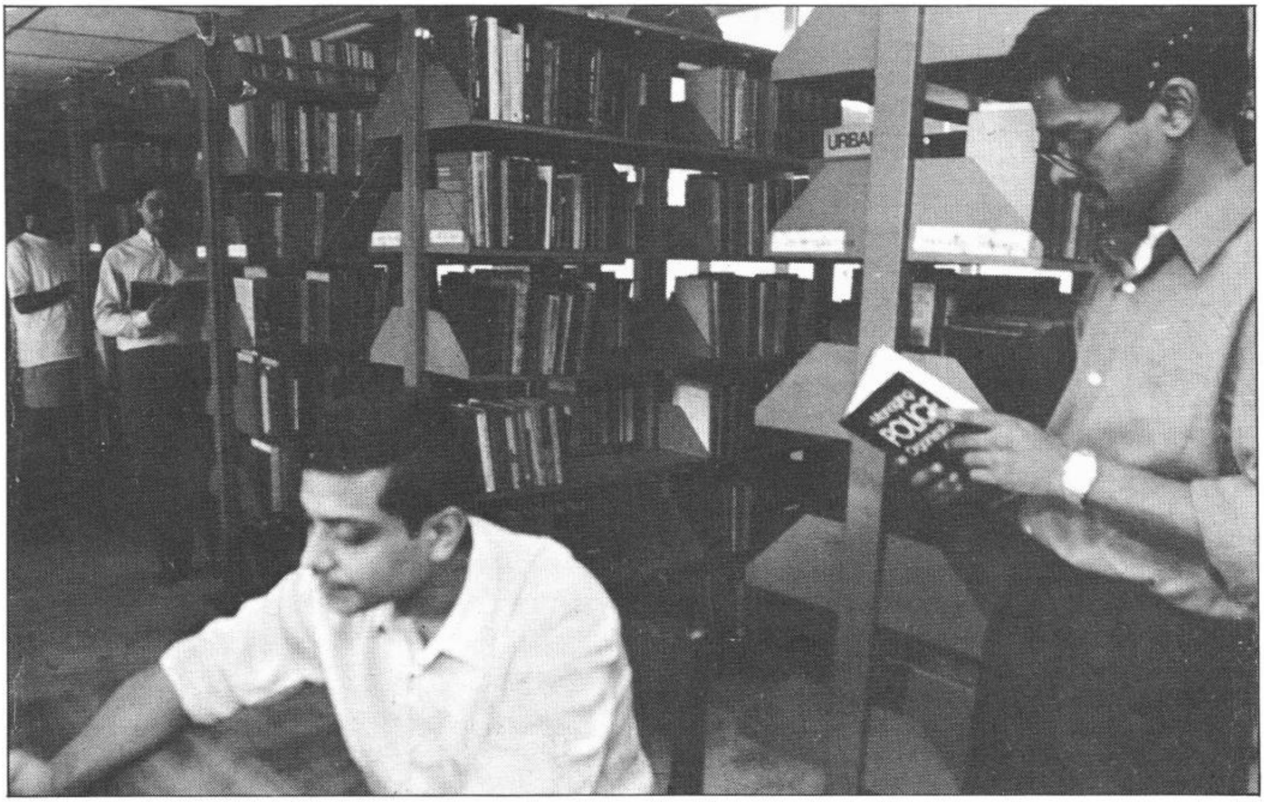

জীবিকার নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে ই-কমার্স

সারা পৃথিবী জুড়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যবসার এই পদ্ধতি ইতিমধ্যেই দারুণ জনপ্রিয়। জীবিকা হিসেবে যাঁরা ই-কমার্স বেছে নিতে চান, তাঁদের জন্য প্রশিক্ষণের সুযোগ আছে কোথায়, খোঁজ-খবর নিয়ে জানিয়েছেন অসিতকুমার চৌধুরী

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বইয়ের দোকান 'আমাজন ডট কম', ২০ লক্ষ টাইটেল আছে সেখানে। ঘরে বসেই 'আমাজন' ঘুরে পছন্দমাফিক বই কেনা যায়। অবশ্যই ইন্টারনেটের মাধ্যমে। খরচ বেশি তো পড়বেই না, বরং ভাল ছাড় পাওয়া যাবে বইয়ের দামে। শুনতে অবাক লাগলেও 'আলপিন থেকে এলিফ্যান্ট পর্যন্ত সবই' বিক্রি হয় ইন্টারনেটের মাধ্যমে। প্রয়োজন নেই দোকানের—স্মার্ট সেলস্‌ম্যান, চকচকে সেল্‌স কাউন্টার—প্রয়োজন নেই কিছুরই। সেসব কাজ করবে ওয়েবসাইট। আর এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ব্যবসার নামই হল 'ই-কমার্স' বা ইলেকট্রনিক কমার্স। এটাই হতে চলেছে নতুন সহস্রাব্দে বাণিজ্যের নতুন নাম।

ই-কমার্স মার্কিন মুলুকে কতটা জনপ্রিয় তা বোঝা যাবে সাম্প্রতিক কিছু তথ্য জানতে পারলে। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকায় ই-কমার্সের মাধ্যমে ব্যবসা হয়েছে ৫০০ কোটি ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় দু'লক্ষ ১৫ হাজার কোটি টাকা। আশা করা হচ্ছে, ২০০০ খ্রিস্টাব্দে এই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে ৪৩ লক্ষ কোটি টাকায়। উন্নত দেশের জনপ্রিয় ই-কমার্স ভারতেও খুলে দেবে বিরাট এক সম্ভাবনার দরজা। তথ্য-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ই-কমার্স পেশা হিসেবে দারুণ লোভনীয়। লক্ষ লক্ষ চাকরির সুযোগ তৈরি করে দেবে এই নতুন ধরনের পেশা। ই-কমার্সের ওয়েবসাইট ডিজাইন ও ডেভেলপিং-এর জন্য প্রয়োজন সৃজনশীলতা। বর্তমানে ভারতে ই-কমার্সের মাধ্যমে প্রায় ২৫০ কোটি টাকার ব্যবসা চলছে। ২০০০ খ্রিস্টাব্দে এটা হবে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা। ই-কমার্সের মাধ্যমে ব্যবসার জন্য যে জিনিসগুলি গুরুত্বপূর্ণ সেগুলি হল দক্ষ টেলিফোন ও ইন্টারনেট ব্যবস্থা, উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা ও নির্বিঘ্ন ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা ও ক্রেডিট কার্ডের সুবিধে।

ই-কমার্সের প্রসার ও চাহিদা প্রাথমিক স্তরে থাকলেও নতুন শতকে তা দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং আগামী বছরগুলিতে পেশা হিসেবে ই-কমার্সকে গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

কয়েকটি ই-কমার্স ট্রেনিং সেন্টারের নাম ও কোর্সের তথ্য দেওয়া গেল :

১। **ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সফট্‌ওয়্যার টেকনোলজি**, ই-সি-২৬, সল্ট লেক, কলকাতা-৭০০০৬৪।
২। **গোর্কি সদন**, তৃতীয় তল, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-৭০০০১৭।

'ই-কমার্স স্পেশ্যালিস্ট' (কোড : জেজি ১০২)
মেয়াদ : আট মাস (পূর্ণ সময়)।
শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক
শিক্ষাক্রম : শেখানো হয় এম সি এস ডি, এম.সি.পি. + ইন্টারনেট প্রভৃতি। কোর্সটির সঙ্গে মাইক্রোসফ্‌ট সার্টিফিকেশন পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। কোর্স শেষে ছ'মাসের একটি প্রজেক্ট করতে হয়। প্রজেক্ট শেষে জীবিকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।
কোর্স ফি : (১,২৫,০০০) টাকার মতো। সুদহীন একাধিক কিস্তিতে দেওয়া যায়।
কোর্স : ইয়ং সায়েন্টিস্ট প্রোগ্রাম ফর স্টুডেন্ট (কোড : জে জি ১০৬)
মেয়াদ : কোর্সের সময় তিন বছর।
শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চ মাধ্যমিক পাশ এবং কলেজের প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রদের জন্য। কলেজের সঙ্গেও কোর্সটি চলতে পারে।
শিক্ষাক্রম : প্রথম বছর শেখানো হয়—বেসিক কম্পিউটার, এম এস ডস উইন্ডোস-৯৮, বেসিক, ইন্টারনেট, অফিস-২০০০। দ্বিতীয় বছর শেখানো হয়—সান জাভা, ভিশুয়াল বেসিক, এইচ টি এম এল কম, এস কিউ এল সার্ভার। তৃতীয় বছরে ইন্টারনেট, ইনফরমেশন সার্ভার, সাইট সার্ভার, এম সি এস ডি এবং কমার্স এডিশ'ন।
কোর্স ফি : ভর্তির সময় ৫৫,০০০ টাকা। প্রতি মাসে ২৯০০ টাকা করে ৩০ মাস।
কোর্সটি এমনভাবে করা যাবে যাতে ছাত্রছাত্রীরা কলেজের ডিগ্রির সঙ্গে এই কোর্সের ডিগ্রিটা পেয়ে যাবে। কোর্সের শেষে ছাত্রছাত্রীদের ছ' মাসের একটি প্রজেক্ট করতে হয়। তখন ১৫,০০০ টাকা ভাতা হিসেবে দেওয়া হয়। ছাত্রছাত্রীরা কোর্স ও প্রজেক্ট শেষ করলে জীবিকার সুযোগ আছে।
৩। **ফার্স্ট কম্পিউটারস**, এক্সপ্রেস টাওয়ার, (দ্বিতীয় তল) ৪২-এ, শেক্‌সপিয়র সরণি, কলকাতা-১৭ :
শাখা : (ক) সিপাই বাজার (ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার কাছে), মেদিনীপুর-৭২১১০১। (খ) ৩৯, বাঙ্গুর অ্যাভেনিউ, (ব্লক-এ) কলকাতা-৭০০০৫৫। (গ) ব্লক-এএ-৩৫, সেক্টর-১ (পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের মোড়), সল্ট লেক, কলকাতা-৭০০০৬৪।
(ঘ) ৭৯/১০, কে বি বোস রোড, বারাসাত,উত্তর ২৪ পরগনা।
কোর্স : 'ফার্স্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট' দুটি মডিউলে ভাগ করা এই কোর্সটিতে 'অ্যাকাউন্ট' ও 'ফিনান্স' বিষয়ে বিভিন্ন শিক্ষা দেওয়া হয়। কোর্সের তৃতীয় মডিউলে কমার্স অ্যাট দ্য নেটে শেখানো হয় ই-কমার্স।
মেয়াদ : ১২ মাসের।
শিক্ষাগত যোগ্যতা : বাণিজ্য শাখায় স্নাতক, সি-এ, সি এসসি, ডব্লিউ এ ছাত্র ভর্তি হতে পারে।
কোর্স ফি : ১৫,০০০ টাকা। ভর্তির ব্যাপারে প্রথমে দু' হাজার টাকা। প্রতিমাসে ১৩০০ টাকা করে ১০ মাস।
শিক্ষাক্রম : ফার্স্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট কোর্সটিতে একেবারে গোড়া থেকে ছাত্রছাত্রীদের পেশাদার হিসেবে গড়ে তোলা হয়। শিক্ষাদানের পদ্ধতি 'স্পাইরাল'।

৪। **ওয়েবটেক**, ৭ শরৎ বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০।
কোর্স : ই-টেক।
মেয়াদ : ১২ মাস।
শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক।
কোর্স ফি : ৫০,০০০ টাকা। কিস্তিতে দেয়।
ভর্তির নিয়ম : প্রতি ব্যাচে ১২ জন। যে-কোনও সময় ভর্তি হওয়া যেতে পারে।
শিক্ষাক্রম : ই-কমার্সের প্যাকেজগুলি শেখানো হয়।
চাকরি : অনেক ক্ষেত্রে ১০০% চুক্তি করা হয়। বিদেশেও চাকরির যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া হয়।
৫। **ইলেকট্রনিক রিসার্চ অ্যান্ড ডিভেলপমেন্ট সেন্টার অব ইন্ডিয়া**, ই-২/১, ব্লক-জি-পি, সেক্টর-৫ সল্ট লেক, কলকাতা-৭০০০৯১।
ভারত সরকারের ইলেকট্রনিক দফতরের অধীনে এই সংস্থা একটি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে ই-কমার্স বিষয়ে একটি কোর্স করায়।
মেয়াদ : দেড় মাস।
শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক অথবা উচ্চ মাধ্যমিক + কম্পিউটারে এ-লেভেল পাশ।
কোর্স ফি : ৯,৫০০ টাকা।
৬। **এস কিউ এল**, ওয়েলেসলি হাউস (৪র্থ তল) ৭, রেড ক্রশ প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১। কোর্স-১ 'ই-বিজনেস' অ্যাপ্লিকেশন ডিভেলপমেন্ট প্রফেশনাল, ২) 'ই-কমার্স' প্রফেশনাল।
যোগ্যতা : উচ্চ মাধ্যমিক পাশ এবং সেইসঙ্গে ও ও পি এস (OOPS) সি ++ আর, ডি বি এম এস বিষয়ে কম্পিউটার জ্ঞান থাকা চাই।
৭। (ক) **এল মিট**, ৬৯ মিড্‌ল রোড, কলকাতা-৭০০০১৪।
(খ) ১/১বি, হাজরা রোড,, কলকাতা-৭০০০২৬। (গ) ৬নং রোড, এইচ বি টাউন, সোদপুর। (ঘ) ৬৫, দে স্ট্রিট, শ্রীরামপুর (হুগলি)। (ঙ) ১৯৭, শরৎ বসু রোড, কলকাতা-২০। (চ) ২৩ডি, নাকতলা লেন, কলকাতা। (ছ) ৪৩৭, নিউ সন্তোষপুর, কলকাতা-৭৫। (জ) ৫৭বি, ইউনিক পার্ক, বেহালা, কলকাতা-৭০০০৩৪। (ঝ) ৩২/৩ কিউ, গড়িয়াহাট রোড (দক্ষিণ) ফ্ল্যাট-১বি, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০০৩১। (ঞ) ৩ গভঃ কলোনি, উইমেন্স কলেজ রোড, মালদা।
কোর্স : 'ই-কমার্স'।
মেয়াদ : পাঁচ মাস।
শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে-কোনও সংস্থা থেকে ভিশুয়াল বেসিক এবং 'সি' বিষয়ে জ্ঞান।
কোর্স ফি : ৯,৫০০ টাকা। কিস্তিতেও দেওয়া চলে।
শিক্ষাক্রম : ই-কমার্স কোর্সটি কয়েকটি মডিউলে ভাগ করা—
মডিউল-১ : ইন্টারনেট বেসিক, নেটওয়ার্কিং, এইচ টি টি পি, এফ টি পি।
মডিউল-২ : এইচ টি এম এল, ডি এইচ টি এম এল।
মডিউল-৩ : জাভা স্ক্রিপ্ট।
মডিউল-৪ : ভি বি স্ক্রিপ্ট, এম এস ফ্রন্ট পেজ

ছোট্ট ইঁদুরের কাণ্ড

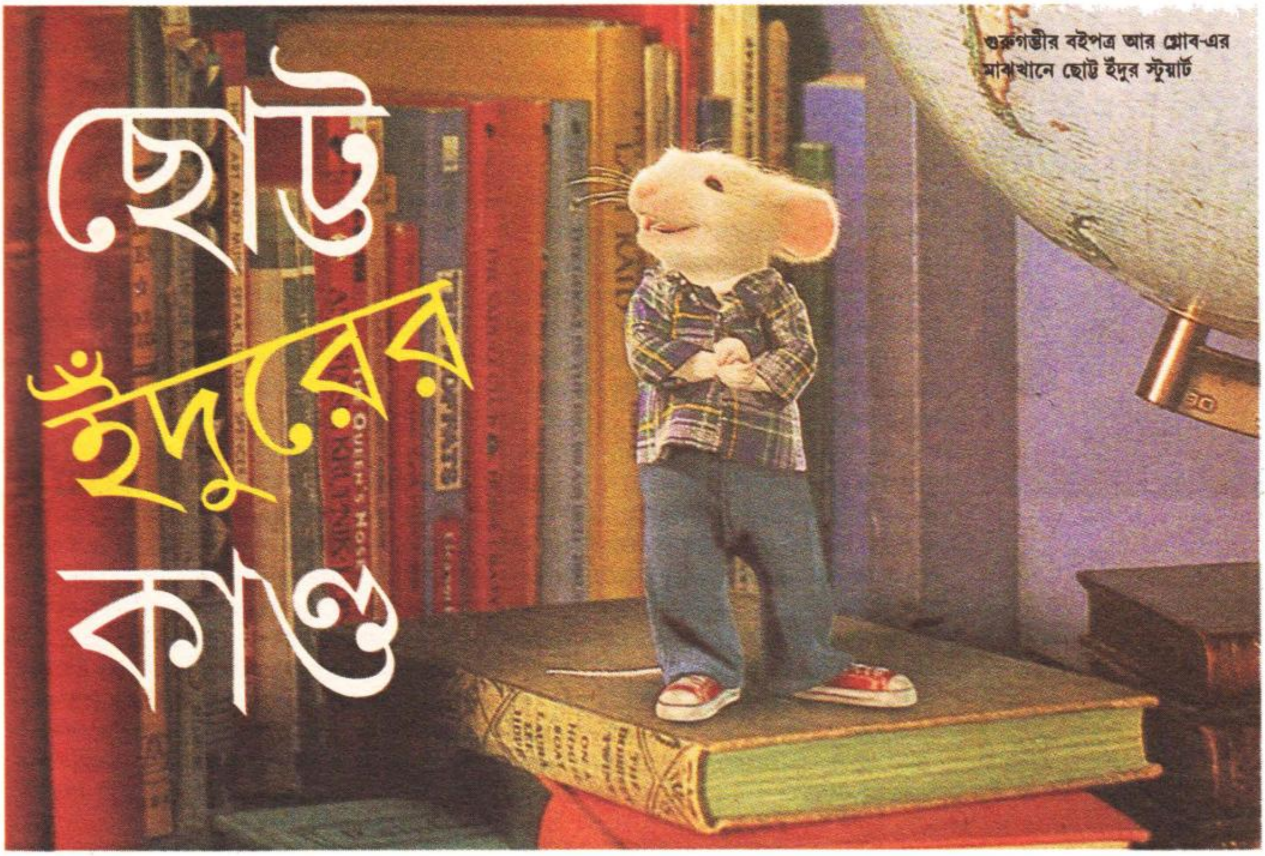

গুরুগম্ভীর বইপত্র আর গ্লোব-এর মাঝখানে ছোট্ট ইঁদুর স্টুয়ার্ট

লিট্ল-পরিবারের সদস্য হয়ে এল ছোট্ট এক ইঁদুর। তার নাম স্টুয়ার্ট। এর পরে স্টুয়ার্টকে নিয়ে অদ্ভুত আর মজার-মজার নানা ঘটনা। সেইসব ঘটনা নিয়েই সাড়া-জাগানো ছবি কলম্বিয়া পিকচার্স-এর 'স্টুযার্ট লিট্ল'। লিখেছেন শমিতা চট্টোপাধ্যায়

লেখকদের মাথায় কখন যে কিসের ভূত চাপে, বলা মুশকিল। তাঁদের স্বপ্ন নিয়েও বিস্তর তত্ত্ব, এমনকী গল্পও তৈরি হতে পারে। আমেরিকার লেখক ই বি ওয়াইট একবার এমনই একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিলেন। ট্রেনে করে ম্যানহাটান ফিরছিলেন। ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঘুম ভাঙল ছেঁড়া স্বপ্নের স্মৃতি মাথায় নিয়ে। মাথার ভেতরে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে একটা ইঁদুর। স্বপ্নে সেই ইঁদুরেরই কাণ্ড দেখছিলেন তিনি। তৈরি হল গল্প। নিজেই বলেছেন, খুব কম স্বপ্নই তাঁর গল্পের বিষয় হয়েছে।

গল্পটা ভারী মজার। লিট্ল-দম্পতি তাঁদের ছেলে জর্জকে কথা দিয়েছেন, তার জন্য একটি 'ভাই' নিয়ে আসবেন। গথাম বলে এক সংস্থা পোষ্যের ব্যবস্থা করে থাকেন। অতএব তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা। লিট্ল পরিবারটি একটু পাগলাটে। পাগল নয় তাই বলে! কিন্তু তাঁরা যদি অন্যদের মতো হতেন, তবে স্টুয়ার্ট ওঁদের পোষ্য হতে পারত না। স্টুয়ার্ট তো একটা ইঁদুর! কিন্তু লিট্ল দম্পতির মনে হল : তা হোক না! বেশ তো 'স্মার্ট'। আর কী দয়া! আহা! বেশ মানাবে তাঁদের পরিবারের সঙ্গে।

লিট্ল-দম্পতির পুষ্যি বেড়ালটার (স্নোবল) কিন্তু ব্যাপারটা মোটেও পছন্দ হয়নি। প্রথমত, সে ভেবেছিল, ইঁদুর মানেই তার সান্ধ্য ভোজের আয়োজন, কিন্তু লিট্ল-দম্পতি বুঝিয়ে দিলেন, স্টুয়ার্ট হল পরিবারেরই একজন। অতএব ওকে খাওয়া চলবে না।

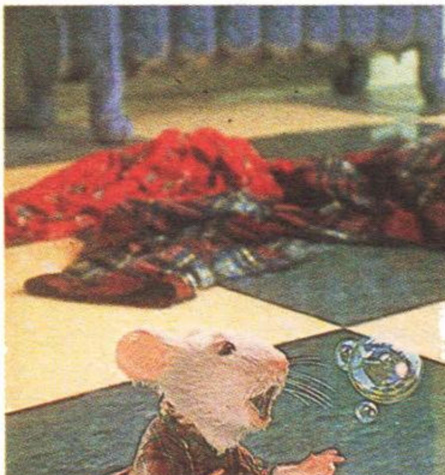

লিট্ল-পরিবারের সদস্য হয়ে এল স্টুয়ার্ট

পরিচালক রব মিনকফ

ব্যস শুরু হয়ে গেল চক্রান্ত। স্নোবেলের বন্ধুবান্ধবরা শুরু করল গোপন শলা-পরামর্শ। শেষে অন্ধকার জগতের মাথা স্মোকি একটা উপায় বের করল। স্মোকির পরমার্শ অনুযায়ী স্টুয়ার্টের নকল বাবা, মা জোগাড় করা হল। তারা এদিক-ওদিকে ঘুরে বেড়ায়। তারাই নাকি স্টুয়ার্টের বাবা, মা। দীর্ঘদিন সন্তান-ছাড়া কিনা! ভারী দুঃখ। অতএব স্টুয়ার্টের যাওয়ার আয়োজন হল। লিট্‌ল পরিবারও ভাবল : এতেই হয়তো স্টুয়ার্টের মঙ্গল ; নিজের আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে থাকতে পেয়ে হয়তো বেচারি বেঁচে যাবে। তাঁরা কি তখন ঘুণাক্ষরেও বুঝেছিলেন, আসলে স্টুয়ার্টকে 'কিডন্যাপ' করারই ছল এটা? স্টুয়ার্ট কিন্তু হার মানে না। শত্রুদের মুখোমুখি হয়...একদিন ফিরেও আসে...সব মিলিয়ে সে এক আশ্চর্য মজার ঘটনা!

গল্পটা শুনেই মনে হয়, যেন কোনও চলচ্চিত্র থেকে তুলে আনা। সত্যি-সত্যিই চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে গল্পটি। ছবির নাম 'স্টুয়ার্ট লিট্‌ল'। পরিচালক রব মিনকফ। ওয়াইটের গল্প ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা হলেও আসলে তা তার চেয়েও বেশি কিছু। হয়তো সে কারণেই 'দ্য লায়ন কিং'-এর সহ পরিচালক রব মিনকফ গল্পটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। যে কাহিনী ৫০ বছর ধরে বইপড়ুয়াদের মাতিয়েছে, এবার পরদায় এসে তা মানুষকে কেমন নাড়ায়, সেটাই দেখার!

এ ছবির প্রযোজক ডগলাস উইক। তাঁর কোম্পানি 'রেড ওয়াগন প্রোডাকশন্‌স'-এর সঙ্গে নামকরা কয়েকজন লেখকের খুবই যোগাযোগ। ভাল কাহিনী, ভাল চিত্রনাট্য সারা পৃথিবীর খ্যাতিমান পরিচালকদের আকর্ষণ করে। এমন নামকরা মানুষরা যেখানে জড়ো হয়েছেন, সেখানে যে ভাল কাজ হবে, বলা বাহুল্য। ফলে কোম্পানিটির সুনামও খুব।

এই স্টুয়ার্ট লিট্‌ল ছবির টিমটিও বেশ ভাল। এঁদের কথা একটু বলা যাক। পরিচালক রব মিনকফ 'ক্যাল আর্টস' ক্যারেকটার অ্যানিমেশন প্রোগ্রাম-এ স্নাতক হন। তারপর ওয়াল্ট ডিজনি প্রোডাকশন্‌স-এর হয়ে অ্যানিমেশনের কাজ শুরু করেন। 'দ্য লিট্‌ল মারমেইড' এবং 'বিউটি অ্যান্ড দ্য বিস্ট' ছবি দু'টির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তিনি। রজার র‍্যাবিটকে নিয়ে তিনি স্বল্প দৈর্ঘ্যের দুটি ছবি করেন—'টামি ট্রাবল' এবং 'রোলার কোস্টার র‍্যাবিট'। স্টুয়ার্ট লিট্‌ল ছবির চিত্রনাট্যকার এম নাইট শ্যামালান। 'দ্য সিক্সথ সেন্স'-এর সুবাদে এখন অনেকেই তাঁকে চেনেন। এ-ছবির পরিচালনা, চিত্রনাট্য তাঁর। ১০ বছর বয়সে ছবি তৈরি করতে শুরু করেন। ১৫ বছর বয়সের মধ্যেই ৪৫টি ছোট ছবি তৈরি করে ফেলেছেন। ১৯৯২ সালে প্রথম কাহিনীচিত্র করেন 'প্রেয়িং উইথ অ্যাঙ্গার'। '৯৭ সালে দ্বিতীয় ছবি 'ওয়াইড অ্যাওয়েক'। এ-ছবির ক্যামেরা পরিচালনায় (ডিরেক্টর অব ফোটোগ্রাফি) আছেন গিলেরমো নাভারো, সম্পাদনায় টম ফিনান। এ ছাড়া আছেন অ্যাকাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত সিনিয়ার ভিশুয়াল এফেক্টস সুপারভাইজার জন ডিকস্ট্রা, অ্যানিমেশন সুপারভাইজার হেনরি অ্যান্ডারসন এবং ভিশুয়াল এফেক্টস সুপারভাইজার জেরোম চেন।

লিট্‌ল-পরিবারের ফোটোর সামনে দাঁড়িয়ে স্টুয়ার্ট দেখছে বাড়ির পোষা কুকুরটিকে

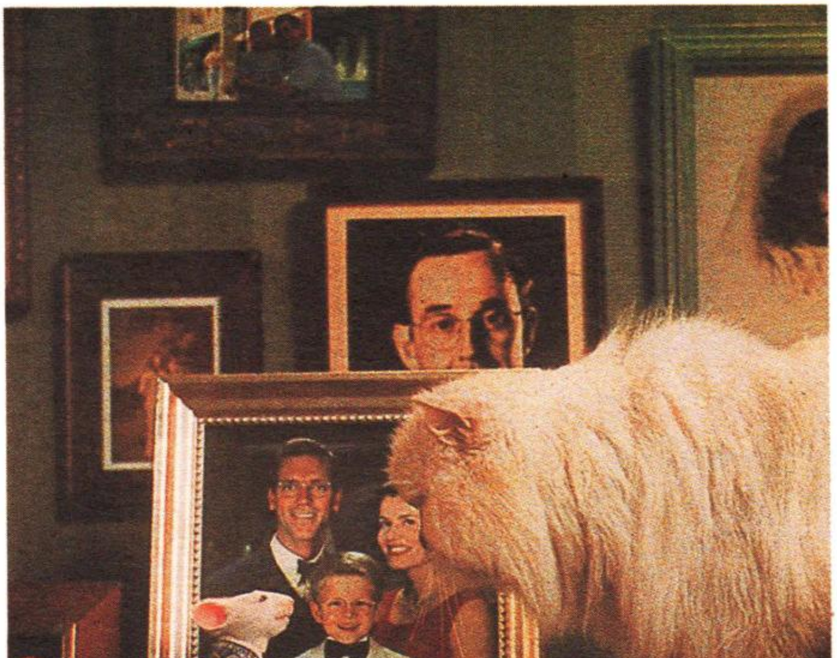

ইঁদুর বলে কি মানুষ নয়

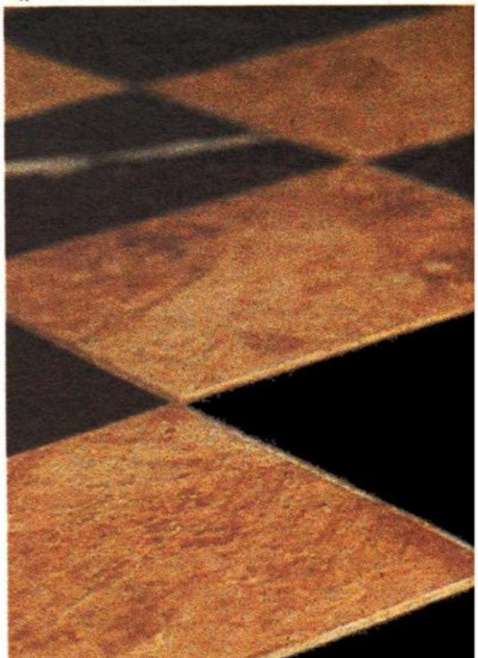

পুরো টিমটিকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করায় স্টুয়ার্ট লিট্‌ল। স্টুয়ার্ট ছাড়া কাহিনী অচল। অথচ এমন কোন ইঁদুর আছে যে 'স্টুয়ার্ট' চরিত্রে প্রাণ দেবে? দু'পায়ে হাঁটে, দিব্যি জামা পরে, সংলাপ বলতে পারে—এমন ইঁদুর তো মিলবে না! অতএব টেকনোলজির শরণাপন্ন হওয়া। কাজটা মোটেও সহজ নয়। '৯৭-এর জুলাইয়ে কাজ শুরু হল। প্রথমে দরকার ইঁদুরকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করা। তারপর শ'য়ে-শ'য়ে স্কেচ। ত্রিমাত্রিক ছবি আঁকা চলল। এমন আঁকতে হবে যাতে চরিত্রটার ব্যক্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। চিত্রবাস্তবতার নতুনতম কারিগরির ব্যবহার হল। হেনরি অ্যান্ডারসনের নেতৃত্বে একজন অ্যানিমেটর স্টুয়ার্টের চলন-বলন-মননের 'লাইব্রেরি' তৈরি করে ফেললেন। মূকাভিনেতা বিল আরউইন-কে মাথায় রেখে স্টুয়ার্টের ধরনধারণ তৈরি হল।

স্টুয়ার্টের লোম এবং জামাকাপড় নিয়ে রীতিমত ভাবনাচিন্তা, গবেষণা করতে হয়েছে। পাঁচ লক্ষেরও বেশি লোম আছে স্টুয়ার্টের মাথায়। এইসব লোমের স্রষ্টা কম্পিউটার। স্টুয়ার্টকে জীবন্ত রূপ দেওয়ার জন্য তার গালের টোল নিয়েও ভেবেছে কম্পিউটার। ওর ডিজিট্যাল জামাটি তৈরি করবার আগে 'ডিজিট্যাল ক্লথ অ্যানিমেটর'রা সেলাইয়ের ক্লাসে যোগ দিয়েছেন। একেবারে যেন বাস্তবসম্মত হয়। জামাটি কোথায় কুঁচকোবে, কোথায় আলো পড়ে ঠিকরোবে—তার জন্যই এই অধ্যয়ন। আর লোম তৈরি হলেই তো হল না! লোমগুলো স্বাভাবিকের মতো ঝকঝক করাও তো চাই। সেজন্য তৈরি হল বিশেষ 'সফ্‌টওয়্যার'। খেয়াল করলে দেখা যাবে, স্টুয়ার্টের চোখের তারার ঝকঝকানি আলাদা। সেজন্যও নেওয়া হয়েছে আলাদা ব্যবস্থা। একটা রুপোর বলের ছবি তোলা হল—পুরো সেটের প্রতিফলন আছে তাতে। ওই প্রতিফলন আবার স্টুয়ার্টের চোখের তারাতেও থাকতে হবে। ওই প্রতিফলনকে ব্যবহার করা হয় ইঁদুরটির জন্য। স্টুয়ার্টের হাতের পাতাও বাদ যায়নি বিশেষ নজর থেকে। পরিচালক নিজে অনেক ভাবনাচিন্তা করেছেন। অনেকরকম হাতের পাতার কথা ভেবেছেন। সবশেষে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, স্টুয়ার্টের হাতের পাতা ইঁদুরের থাবার মতো হবে না। ওর হাত দুটি বাচ্চা ছেলের হাতের মতো। আসলে স্টুয়ার্ট ইঁদুর হয়েও ঠিক ইঁদুর নয়। সে ইঁদুরের জায়গা থেকে পৃথিবীটাকে দেখে না। ইঁদুর বলে কি সে 'মানুষ' নয়? অনেকটা এরকমই যেন ছবির স্টুয়ার্ট। স্টুয়ার্ট বোঝে, সে অন্যদের চেয়ে দেখতে আলাদা। কিন্তু তাতে কী? অন্যদের চেয়ে সে তো কিছু কম যায় না। আর ছোটরা, যারা নিজেদের চেয়ে লম্বায় বড়দের দুনিয়াটাকে বিস্ময় আর ভীতি মিশিয়ে দেখে, তাদের কাছে স্টুয়ার্টের মতো তিন ইঞ্চির একজনের বীরত্ব বেশ উৎসাহদায়ক। স্টুয়ার্ট ইঁদুর, অথচ ইঁদুর নয়। মানুষের মতো দেখতেও নয়। সব মিলিয়ে ব্যাপারটা বেশ মজাদার। আর ছবিতে অন্য তারকাদের চেয়ে সে এতটুকুও কম গুরুত্ব পায়নি। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ক্ষেত্রে গিলেরমো যেভাবে আলো করেছেন, স্টুয়ার্টের ক্ষেত্রেও সে ধরন বজায়

লিট্‌ল-পরিবার

ওয়েবরে

এনার্জী এডু

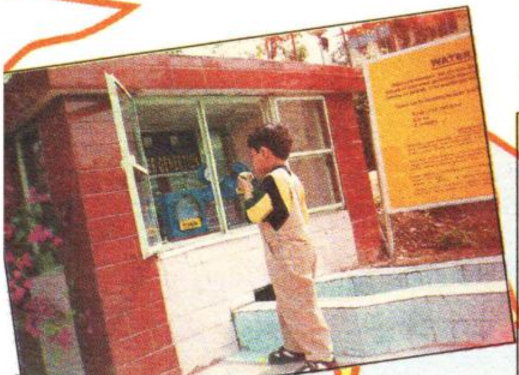

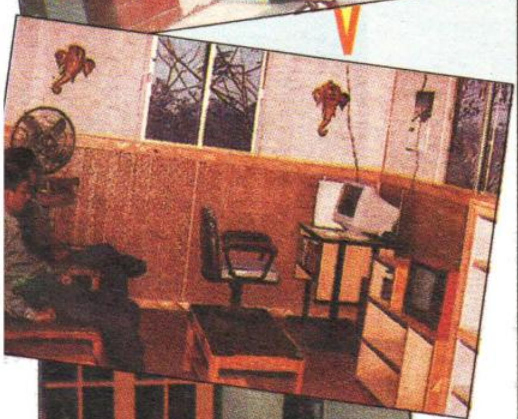

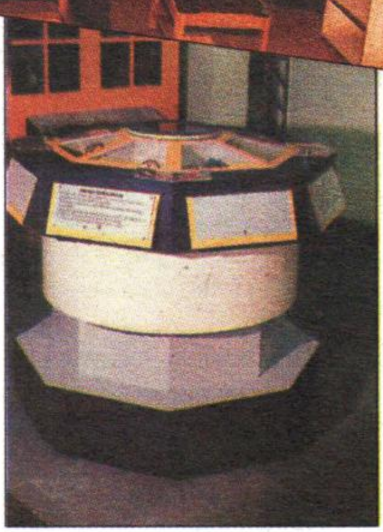

	1st	2nd	3rd	4th	
MON					B R E A K
TUE					
WED					
THU					
FRI					
SAT					

Name : .... **Clas**

WBREDA : Power to People

'দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়তে অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহার অপরিহার্য।'

ডার নিবেদন

ডুকেশন পার্ক

5th	6th	7th	8th

ass .... Sec .... Roll ....

কলকাতার ই.এম. বাইপাসের ধারে সায়েন্স সিটির বিপরীতে, সুন্দর পরিবেশে দেখে যাও এনার্জী পার্ক। অপ্রচলিত শক্তি বিষয়ে জানতে পারবে অসংখ্য তথ্য। পার্কে আছে বায়োগ্যাস প্রকল্প, গ্যাসিফায়ার প্রকল্প।

প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত এনার্জী পার্ক খোলা। প্রতি শুক্রবার বন্ধ।

কল্প হলেও সত্যি !

চিত্র-১ : রাস্তা দিয়ে সাঁই সাঁই করে ছুটছে গাড়িগুলি। কিন্তু কি আশ্চর্য ধোঁয়া মোটেই নেই! ব্যাপারটা কি? আসলে এই গাড়িগুলি চালানোর জন্য পেট্রোল কিংবা ডিজেল লাগে না। তাই ধোঁয়াও হয় না। তাহলে গাড়ি চলছে কিসে? বিশ্বাস কর আর নাই কর গাড়িগুলি চলছে সৌর শক্তিতে। কারণ এক লিটার পেট্রোলের দাম যে ১ হাজার টাকা!

ভাল করে গাড়িগুলি লক্ষ কর। মাথার ক্যারিয়ারে টিভির অ্যান্টেনার মতো ধাতব পাতের উপরে জানালার কাঁচের মতো বর্গাকার কয়েকটি স্বচ্ছ পাত সার দিয়ে লাগানো। ওগুলি সৌর কোষ। সূর্যালোক থেকে টেনে নিচ্ছে আলোকশক্তি। আর ওই বর্গাকার পাত অর্থাৎ কোষগুলি সেই আলোক শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তি এবং বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করছে।

চিত্র-২ : এই বছর ১০ আগেও নেহাত প্রয়োজন না পড়লে মনোতোষবাবুর বাড়ির লোকেরা খুব একটা বড় ছাদে উঠতেন না। সকালে আর বিকালে দু'বার মনোতোষবাবু ছাদে যেতেন গাছে জল দিতে। আর তাঁর বাড়ির পরিচারিকা ছাদে যেতেন কাপড় মেলতে ও শুকনো কাপড় আনতে। গত ১০ বছরে পরিস্থিতি আমূল পাল্টেছে। এখন দিনের একটা বড় সময় ছাদেই কাটান মনোতোষ গিন্নি। কারণ, ছাদটাই এখন তাঁর রান্নাঘর। কয়েকটি সৌর কুকার পাশাপাশি সাজানো। কয়লা ও কাঠের জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার পরিবেশ আইনে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বাজারে গ্যাসের এক একটি সিলিন্ডারের দাম পড়ছে পাঁচ হাজার টাকা। অতএব সৌরশক্তিকেই ব্যবহার করতে হচ্ছে জ্বালানি হিসাবে। প্রাথমিক বড় একটা খরচ রয়েছে ঠিকই। কিন্তু তারপর কোনও খরচই নেই। সূর্যের আলো নিতে পয়সা দিতে হয় না।

চিত্র ৩ : রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের মাথায় বসানো রয়েছে বর্গাকার স্ফটিকের মতো সৌর কোষ। প্রতিটি ল্যাম্পপোস্টের বাতি জ্বলছে সৌর শক্তিতে। প্রতি বাড়ির ছাদেই টিভির অ্যান্টেনার মতো সার দিয়ে বসানো রয়েছে সৌর কোষ। পরমাণু বিদ্যুৎ পাচ্ছে ভাগ্যবান কয়েকজন আর সরকারি কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সাধারণ মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছচ্ছে সৌর শক্তি। বাড়ির প্রয়োজনের বেশি বিদ্যুৎ চলে যাচ্ছে উপরের তারে। সেখান থেকে বিদ্যুৎ গ্রিডে। কয়লা নির্ভর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র পুরোপুরি নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। পরিবেশ বাঁচাতেই এই ব্যবস্থা।

চিত্র ৪ : রাস্তার পাশে এতটুকুও জঞ্জাল পড়ে নেই। ধাপার মাঠের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে নাকে আর রুমাল দিতে হয় না। কারণ, জঞ্জাল আর জমানোর প্রশ্ন নেই। সব জঞ্জাল চলে যাচ্ছে ধাপার বিদ্যুৎ কারখানায়। সেখান থেকে সেই পরিবেশ ভাল করা বিদ্যুৎ চলে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের বাড়িতে। মানুষকে শুধু নিজেদের বাড়ির জঞ্জাল প্রতিদিন ওই বিদ্যুৎ কারখানার গাড়িতে ফেলে দিতে হবে। গাড়ি যাবে একেবারে বাড়ির দরজায়। বেশি বিদ্যুৎ কেউ নিলে তাঁরা বিদ্যুতের দামে ছাড়ও পাবেন।

.... মনে হতে পারে কল্প কাহিনী। কিন্তু এটাই হবে ৪০ বছর পরের কলকাতার শহর চিত্র। বিজ্ঞান এবং পরিবেশ ভাবনা মানুষকে এই উচ্চতায় পৌঁছে দেবে। আর ২০০০ সালের কলকাতায় বসেই ৪০ বছর পরের পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচয় করা এখন সম্ভব। এই সুযোগ করে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পুনর্নবীকরণ শক্তি উন্নয়ন সংস্থা কিংবা ওয়েবরেডা। ইস্টার্ন বাইপাসে বিজ্ঞান নগরীর ঠিক উল্টো দিকে বিজ্ঞানের আরও একটা চমক নিয়ে হাজির হয়েছে এনার্জি এডুকেশন পার্ক। বিকল্প শক্তির ছড়াছড়ি এখানে। যা কিনা হবে ৪০ বছর পরের পৃথিবীর চালিকা শক্তি।

কি কি রয়েছে এনার্জি এডুকেশন পার্কে ?

সৌর শক্তিতে ঘুরছে পাখা। ফ্রিজ চালাতেও ব্যবহার করা হচ্ছে সৌর কোষ থেকে প্রাপ্ত বিদ্যুৎ। কাঠ থেকে উৎপন্ন করা হচ্ছে বিদ্যুৎ। সেই বিদ্যুৎ নিয়েই আলোকিত গোটা এনার্জি এডুকেশন পার্ক। তা ছাড়া ইতঃস্তত ছড়ানো হয়েছে মজার মজার খেলা। নতুন নতুন তথ্য। শক্তি উৎপন্ন করাই শুধু নয়, পরিবেশ রক্ষার বিষয়টিও গুরুত্ব পাচ্ছে এইসব তথ্যে। আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ এই এনার্জি এডুকেশন পার্ক।

এখানে না এলে ভবিষ্যতকে চিনতে বুঝতে অসুবিধা হবে। ছাত্রছাত্রীদের তাই আসতেই হবে এখানে।

পশ্চিমবঙ্গ পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উন্নয়ণ সংস্থা

বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও অপ্রচলিত শক্তি দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

এল.এ.ব্লক, বি-০৪, সেক্টর-৩, সল্ট লেক, কলিকাতা-৭০০ ০৯১

ফোন : ৩৩৫ ৫৩৭৮/৬৪৫১, ফ্যাক্স : ৩৩৫ ৩২৫৮

e mail : wbreda@cal.vsnl.net.in

ছোট্ট ইঁদুর স্টুয়ার্ট, দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে হয়

খেতে বসেছি, এখন বিরক্ত কোরো না

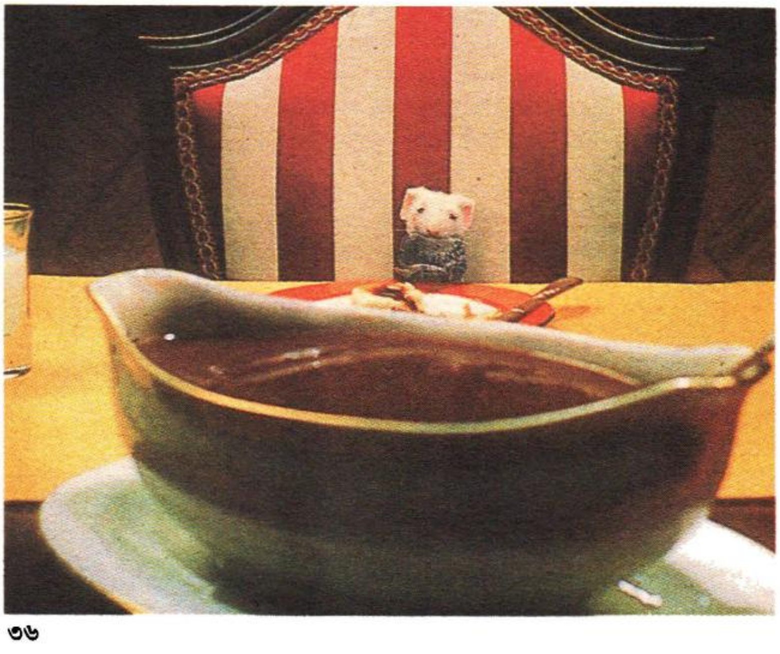

রাখা হয়েছে।

এইভাবে যত্ন নিয়ে স্টুয়ার্টকে তো তৈরি করা হল। এর পর তাকে দৃশ্যের অন্তর্ভুত করা। অনেক জায়গাতেই কাজটা বেশ কঠিন, কারণ সেখানে মানুষ বা বেড়ালের সঙ্গে স্টুয়ার্টকে মোকাবিলা করতে হচ্ছে। তবে স্টুয়ার্টকে নিয়ে সহশিল্পীরা কিন্তু মহা খুশি। বলা ভাল, ও সবাইকে উদ্দীপিত করেছে।

ছবিতে আটটি বেড়ালের ভূমিকা আছে। তার জন্য শিক্ষিত বিভিন্ন জাতের ২৩টি বেড়ালকে কাজে লাগানো হয়। এক স্নোবলের ভূমিকাতেই পাঁচটি বেড়াল অভিনয় করে। বেড়াল নিয়ে কাজ করার ঝক্কি খুব! বেড়ালের ট্রেনাররা তো একেবারে হিমশিম খেয়ে গেছেন। ওদের 'মুড' বুঝে ওঠা দায়! তারপরে আবার যখন সহশিল্পী অন্য বেড়াল, তখন তারা বেঁকে বসবে কি না, কে জানে। আবার স্টুয়ার্টের সঙ্গে মোলাকাতের সময় শিক্ষকদের তটস্থ থাকতে হয়েছে। ইঁদুর, তা যেমনই হোক না কেন, ইঁদুর-বেড়ালে কি আর সদ্ভাব হয়? আর স্নোবল এমনিতেই বিষয়টিতে একটু স্পর্শকাতর। তার আশ্রয়দাতারা যখন ইঁদুর নিয়ে মাতামাতি করে, তার রাগ বা অভিমান তো হতেই

পারে। এমনকী,হিংসেও। অবহেলা কেই বা সহ্য করতে পারে? এইরকম জটিল ভূমিকায় বেড়ালকে দিয়ে অভিনয় করিয়ে নেওয়া যে চাট্টিখানি ব্যাপার নয়, তা সাধারণ মানুষও বুঝবেন।

অভিনেতা-অভিনেত্রী বাছাইয়ের ব্যাপারেও পরিচালক,প্রযোজক যথেষ্ট খুঁতখুঁতে ছিলেন। লিট্‌ল পরিবারের খামখেয়ালিপনা, তাঁদের অনন্যতা, বিশেষত্ব সবকিছু মাথায় রেখেই চরিত্র বাছাই করতে হবে। স্টুয়ার্টের গলা! অর্থাৎ কাকে দিয়ে 'ডাব' করানো হবে স্টুয়ার্টের সংলাপ? কেমন হবে সেই গলা? যেমন-তেমন হলে তো চলবে না। তার কথা বলার ঢঙের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করবে। এমনকী তার ব্যক্তিত্বও ফুটে বেরোবে তার কথা বলার ধরনে। শেষ পর্যন্ত এলেন মাইকেল জে ফক্স, তাঁর বিখ্যাত গলা নিয়ে। এন বি সি সিরিজের 'ফ্যামিলি টাইজ'-এর জন্য তিনি দূরদর্শন দর্শকের কাছে পরিচিত। তিনি তিনটি 'এম্মি' পুরস্কার এবং একটি 'গোল্ডেন গ্লোব' পুরস্কার পেয়েছেন। সেই ফক্স এখন ইঁদুরের গলায়। জিনা ডেভিস হলেন শ্রীমতী লিট্‌ল। অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্তা এই অভিনেত্রী একটি অনন্য চরিত্রের জন্য যথার্থ নির্বাচন। শ্রী লিট্‌লের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন হিউ লরি। লরি লেখেন, গান করেন, পরিচালনা করেন, অভিনয় তো করেনই। লরিকে পরিচালক নির্বাচন করেন যে চরিত্রের জন্য, তা অবশ্যই একটু ভিন্ন স্বাদের। ন'বছরের ছেলে জোনাথান লিপনিক্কি কাহিনীর চরিত্রের চেয়ে বেশ কিছুটা ছোট। তবু ওকে নিতে পরিচালক দ্বিধা বোধ করেননি। ওর কাজে পরিচালক তো বটেই, প্রযোজকও বেশ খুশি।

১৯৯৮-এর গ্রীষ্মে সোনি পিকচার্স স্টুডিয়োতে স্টুয়ার্ট লিট্‌লে'র কাজ শুরু হল। চিত্রায়ণের মূল কাজ শুরু হওয়ার তিন মাস আগে থেকেই শিল্পীরা সেটের কাজে লেগে পড়েন। ৩ অগস্ট 'লিট্‌ল হাউস'-এর ওপরতলার ভেতরে মূল চিত্রায়ণের কাজ শুরু হয়। ১০৫ পাতার একটা গাইড তৈরি হয়। এই গাইডে লেখা ছিল বাড়ির ভেতরটা কেমন দেখতে হবে। তৈরি করেন প্রোডাকশন ডিজাইনার বিল ব্রেজকি। এর মধ্যে বিস্তারিতভাবে আঁকা ছিল লিট্‌ল বাড়ির খুঁটিনাটি। স্টুয়ার্টের ঘরটা দেখলে মনে হবে যেন একটা ছোট্ট ছেলের ঘর। কখনওই একটা ইঁদুরের ঘর নয়। আসলে সারা ছবিতেই ভুলিয়ে দিতে চাওয়া হয়েছে যে, স্টুয়ার্ট একটি লেজবিশিষ্ট ইঁদুর বই আর কিচ্ছু নয়। লিট্‌ল-দম্পতির ঘরে আভিজাত্যের ছাপ। চিরন্তন সৌন্দর্যের পোঁচ সেখানে। ব্রেজকি ঘরের মেঝেকেও এতটুকু কম গুরুত্ব দেননি। বাড়িতে কী না নেই? লিভিংরুম, মিউজিক রুম,লাইব্রেরি, রান্নাঘর...কিচ্ছুর ত্রুটি নেই।

লিট্‌ল-পরিবার : ছেলে জর্জের সঙ্গে দারুণ সম্পর্ক স্টুয়ার্টের

বিপদ লিট্‌ল-পরিবারের খুদে সদস্যটির পিছু ছাড়ছে না

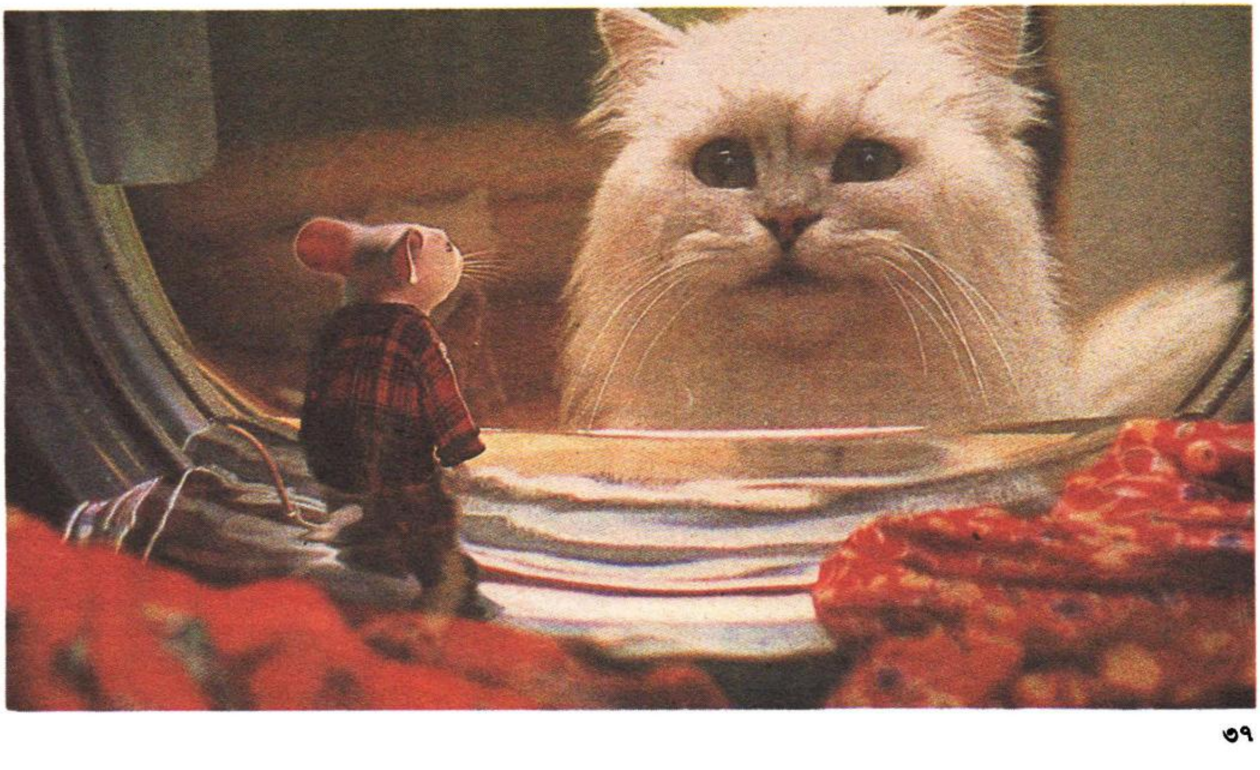

বিনামূল্যে 'স্টুয়ার্ট লিট্‌ল-এর ২০০টি টিকিট

নাম : ....
অভিভাবকের নাম : ....
ঠিকানা : ....
....
....
স্কুলের নাম : ....
বয়স : ....

ওপরের কুপনটি কেটে 'আনন্দমেলা'র ঠিকানায় পাঠাও। প্রথম যে ১০০ জনের কুপন 'আনন্দমেলা' পত্রিকার দফতরে আগে এসে পৌঁছবে, তাদের কলম্বিয়া ট্রাইস্টার পিকচার্স ও আনন্দমেলার পক্ষ থেকে বিনামূল্যে দেওয়া হবে 'স্টুয়ার্ট লিট্‌ল' দেখার ১০০টি টিকিট। সঙ্গে ১০০ জন অভিভাবকের জন্যও দেওয়া হবে আরও ১০০টি টিকিট, বিনামূল্যে। সিনেমাটি দেখানো হবে গ্লোব প্রেক্ষাগৃহে,৫ মে ২০০০ তারিখে,ইভিনিং শো-এ। কুপনের প্রতিলিপি গৃহীত হবে না।

এসো, বন্ধুত্ব পাতাই

দর্শকরা যদি লিট্‌লদের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হন, তাঁদের মনে হবে, এটা খুব পরিচিত পরিবেশ। পুরনোর সঙ্গে লিট্‌লরা নতুনকেও মিলিয়েছেন। ডেস্কে কম্পিউটার, রান্নাঘরে টিভি—সবই রয়েছে। আর রং দেখলে মন ভরে যায়। যেখানে যেমনটি দরকার, ঠিক যেন তেমনটি। ব্রেজকি আসলে এমনভাবে রং ব্যবহার করেছেন, যাতে তা একই সঙ্গে হয়ে ওঠে বাস্তব ও রূপকথায় মেশা কল্পজগতের প্রতীক।

চিত্রায়ণের প্রধান কাজ হয়ে যায় '৯৮-এর নভেম্বরের মাঝামাঝি নাগাদ। শুটিঙের কাজ স্টেজ ৩০-এও হয়। এখানে ১৯৪০-এ এস্থার উইলিয়াম্‌স-এর ছবির শুটিং হয়েছিল। ফুটবল-মাঠের মতো জায়গাটি কখন যেন হয়ে গেল গল্পে 'সেন্ট্রাল পার্ক'। অনেক মানুষের, ছোট-ছোট ছেলেমেয়ের ছুটোছুটি সেখানে। দৌড়ের প্রস্তুতি চলছে। বেলুন, খাবারদাবারের ছড়াছড়ি। তৈরি হয়ে গেল পুকুর। সেখানে আবার নৌকো চলে। নৌকো রেসের জন্য নৌকোও তৈরি হয়েছে। ছবির জন্য প্রস্তুত হয়েছে রিমোট-কন্ট্রোল্‌ড নৌকো। পরিচালক 'কাট' বললেই সুইচের সাহায্যে নৌকো ঘুরে যায়। ফিরে আসো পুরনো জায়গায়। আবার শুট করা হয়। লাইফগার্ড সবসময়ের জন্য প্রস্তুত। 'সেন্ট্রাল পার্ক'-এ যতক্ষণ শুটিং চলে, ব্যবস্থাপনার কোনও খুঁত নেই। ৫৫ সুপার টেকনো-ক্রেন পুকুরের ওপর দিয়ে রয়েছে। তার কাজ নৌকোগুলোর ছবি তোলা।

ঐতিহাসিক স্টেজ ১৫-এ 'দ্য উইজার্ড অব ওজ' শুট করা হয়েছিল। সেখানেই ছবির প্রয়োজনে তৈরি হয়েছে নিউ ইয়র্ক শহরের 'ফিফ্‌থ অ্যাভেনিউ'। রাস্তায় ম্যানহোল। রাস্তার ধারে ফাটল ধরেছে। টারের রাস্তাটা যেন সত্যি শহরের বুক থেকে উঠে এসেছে। এই শহরেই লিট্‌লদের সাতপুরুষের বাস।

যেখানে ছবির একজন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র এক ইঁদুরছানা, সে-ছবিতে কাজ করতে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কেমন লাগে? লিট্‌ল পরিবারের লোকজন অর্থাৎ জিনা ডেভিস, হিউ লরি এবং জোনাথন লিপনিকি কিন্তু স্টুয়ার্টকে নিয়ে ভারী খুশি। লরির বক্তব্য, "ওর মধ্যে একটা ব্র্যান্ডোর মতো ব্যাপার আছে।" স্টুয়ার্ট নাকি বড় তারকাদের মতো খুবই ইমেজ-সচেতন। জিনা ডেভিসের মতে স্টুয়ার্ট যেমন উৎসাহ নিয়ে কাজকর্ম করে, তাতে অন্যদের মধ্যেও তা সংক্রামিত হতে বাধ্য। আর লিপনিকি তো স্টুয়ার্টের নৌকো-চালনা দেখে মুগ্ধ। সত্যিই আশ্চর্য ব্যাপার। গোলাপি নাকঅলা তিন ইঞ্চির একটা উদার ইঁদুর সকলের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। আর দর্শককে চমকে দেবে ছবির স্পেশ্যাল এফেক্টের জাদুও।

৫০ বছর আগের একটি কাহিনী ও ছোট্ট ইঁদুরটি যে লোক মাতাবে তাতে আর আশ্চর্য কী? তাঁর স্রষ্টা লোকটিও তো কম যেতেন না! অনেক ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন জীবনভর, যা তাঁকে সমৃদ্ধ করেছে। আর উঁচুতে না উঠলে তো শিশুদের মতো করে, শিশুদের ভাষায় কথা বলা যায় না। ওয়াইট কাজ শুরু করেছিলেন সাংবাদিক ও বিজ্ঞাপনের কপিরাইটার হিসেবে। ১৯২৬-এ 'দ্য নিউ ইয়র্কার'-এ যোগ দেওয়ার পর সম্পাদকীয় রচনা লিখতে শুরু করেন। ওয়াইটের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ 'দ্য লেডি ইজ গোল্ড' (কাব্য সংগ্রহ), 'কুয়ো ভাদিমাস', 'দ্য ওয়াইল্ড ফ্ল্যাগ' এবং আরও কিছু বই। স্টুয়ার্ট লিট্‌ল লেখেন ১৯৪৫-এ। অনেক পুরস্কারও পান সারাজীবন।

৫০ বছরের আগের কাহিনী ও তার নায়ক এবং আজকের প্রযুক্তি। এই নিয়েই রব মিনকফের এই ছবি। কাজটা অত্যন্ত শক্ত। কিন্তু অসম্ভব পরিশ্রম, চেষ্টা, ধৈর্য ও কারিগরি জ্ঞান যেখানে মেলে, সেখানে সাফল্য আসতে বাধ্য। অবশ্যই এ-কথা অনস্বীকার্য যে, বড় বড় ব্যানারের ছবি মানুষকে এমনিতেই টেনে নেয়। কিন্তু মানুষকে বসিয়ে রাখার জন্য পরিচালক, কলাকুশলীদের যথেষ্ট খাটাখাটনি করতে হয়। স্টুয়ার্ট লিট্‌লের ঝুলিতে সবই আছে। ভাল কাহিনী থেকে স্টুয়ার্ট লিট্‌ল পর্যন্ত স-ব। সত্যিকারের বিনোদনের সব উপাদানই তো রয়েছে। দর্শক এর থেকে মুখ ফেরাবে কেমন করে?

ফোটো : সোনি পিকচার্স ইমেজওয়ার্কস কলম্বিয়া/ট্রাইস্টার মোশন পিকচার গ্রুপ-এর সৌজন্যে

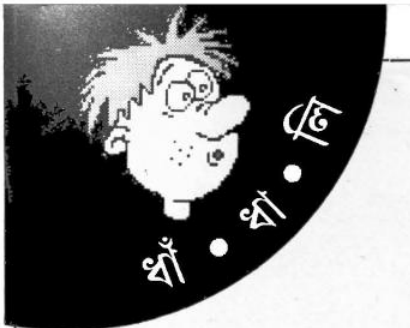

একটুখানি এদিক-ওদিক, পালটে গেল নামের মানে

অনেকদিন পরে বিজয়দার কথা মনে পড়ল। বিজয়দা ছিলেন আমাদের পাড়ায় একটা চুল কাটার দোকানের নিয়মিত খদ্দের। দোকানটি খুব বেশি বড় ছিল না, কিন্তু ভিড় থাকত প্রায় সবসময়েই। মালিকের নামেই চালু হয়ে গিয়েছিল দোকানের নাম— নেপালের সেলুন। নেপালের অবশ্য একেবারেই পছন্দ ছিল না সে নামটা। নেপাল চেয়েছিল বেশ সমীহ জাগানো জবরদস্ত এক নাম। মনে আছে আমরাও এক-একজন এক-একটা নাম দিয়েছিলাম, কিন্তু নেপালের পছন্দ হয়নি কোনওটাই।

অবশেষে বিজয়দারই দেওয়া একটা নাম ওর খুব পছন্দ হল। বিজয়দা দিয়েছিলেন, 'দি নেপচুন সেলুন'। এরকম ইংরেজিমাখা গালভরা জুতসই এক নাম পেয়ে মহা খুশি সেলুনের মালিক।

পরদিন সকালে দোকানের সাইনবোর্ড দেখে আশেপাশের লোকজনের চোখ কপালে ওঠে আর কি! সকলেই রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে ওই দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায়। তাজ্জব কাণ্ড! সাইনবোর্ডে লেখা ছিল 'দিনে পচুন সেলুন'।

আসলে, সামান্য একটুখানি এদিক-ওদিক হলেই অনেক সময়ে অনেককিছু গরমিল হয়ে যায়। ঘটে যায় ভয়ানক কাণ্ড!

আজ তা হলে এরকমেরই তিনটি মজার ধাঁধা উপহার দেওয়া যাক। এগুলো আসলে ধাঁধা হওয়ার কথা নয়, সামান্য একটু মিলের অভাবেই এগুলো ধাঁধা হয়ে গেছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, সমাধান পাঠাও!

এক কাঠি নাড়িয়ে

সেদিন অঙ্কের ক্লাসে সার আসেননি। যে যার মতো যা খুশি তাই করছে। এরই মধ্যে গোবর্ধন কোথা থেকে কয়েকটা দেশলাই কাঠি জোগাড় করে আনল। বলল, "আয়, খেলি। কাঠি সাজানো খেলা।" আমি, গণপতি আর গোবর্ধন তিনজনে মিলে দেশলাই কাঠি সাজিয়ে বেঞ্চির ওপরে নানারকম চিত্র তৈরি করছি। এমন সময় হঠাৎ হেডসার এসে হাজির।

হেডসার এসেই গম্ভীর হয়ে বললেন, "এসব কী হচ্ছে?" যারা গোলমাল করছিল, সব চুপ।

গোবর্ধন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "সার কাঠি দিয়ে অঙ্ক করছি।"

"কাঠি দিয়ে অঙ্ক করছ? কই, দেখি।" বলেই হেডসার বেঞ্চির ওপরে ঝুঁকে পড়ে কাঠি সাজানো দেখতে লাগলেন। তারপর বললেন, "একটি কাঠি ভুল জায়গায় বসিয়েছ, সেটিকে ঠিক করে বসাতে হবে। কেবল একটিমাত্র কাঠি নাড়িয়ে গাণিতিকভাবে সত্যি হয় এমন করো। নইলে কিন্তু শাস্তি।"

কাঠিগুলি সাজিয়েছিল আসলে গণপতি। তেমন কিছু না ভেবেই। কাঁচুমাচু মুখ করে আমরা সবাই বসলাম, "সার, আর কোনওদিন করব না, সার।"

সাজানোটা ছিল এইরকম,

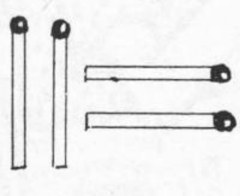

আনন্দমেলার বন্ধুদের বলি, এখন তোমরাই ভরসা।

বারো কাঠির খেলা

আর একদিনের কথা বলি। সেদিনও দেশলাই কাঠি দিয়ে খেলা হচ্ছিল। অঙ্কের খেলা। গণপতি একটা সরল অঙ্ক তৈরি করেছিল, কাঠি দিয়ে। বারোটা কাঠি। কিন্তু অঙ্কটা ভুল ছিল। রোমান অক্ষরে সাজিয়েছিল, এরকম,

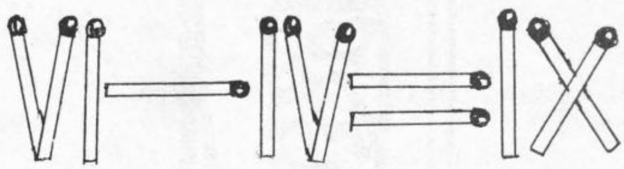

একটি কাঠির জায়গা বদলে দিয়ে অঙ্কটা ঠিক করো তো।

ছাপার গোলমাল

অঙ্কের বইয়ে ভুল একেবারেই সহ্য করতে পারেন না আমাদের অঙ্কের মাস্টারমশাই যোগেনবাবু। সেদিন মাস্টারমশাই ক্লাসে ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গে শ্রীমান জিষ্ণুদেব অঙ্ক বইয়ের একটা পাতা খুলে বলল, "সার এই অঙ্কটা বইয়ে ভুল আছে।"

মাস্টারমশাই তাকিয়ে দেখলেন,

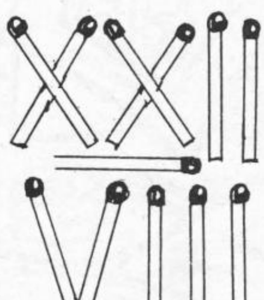

সত্যিই তো! লেখা আছে, 7 + 7 − 7 = 740 ; বইয়ে সংখ্যাগুলো সব ইংরেজিতেই লেখা।

দেখেশুনে বললেন, "ছাপার ভুল।

মাত্র একটি লাইনের জন্য এতখানি গোলমাল!"

শুদ্ধভাবে কীরকম ছাপা হওয়া উচিত ছিল? মনে রাখতে হবে, ভুলটা কিন্তু শুধুই একটি লাইনের জন্য।

১২ এপ্রিল সংখ্যার উত্তর

ভুল শোনার ফল

আসল অঙ্কটা যা ছিল	গণপতি যেভাবে টুকেছিল
১১১	১১১
৩৩৩	৩০০
৫৫৫	০৫৫
৭৭৭	৭৭৭
৯৯৯	০৯০
২৭৭৫	১৩৩৩

জ্যামিতির ক্লাসে

ক্লাসে ছাত্র এসেছিল ৩০ জন। কারণ, লাইনে দাঁড়ানো ছেলেদের মধ্যে কম্পাস ছিল যাদের কাছে তারা হল প্রথম থেকে ৫ম, ১০ম, ১৫তম, ২০তম, ২৫তম এবং ৩০তম। রুলার ছিল যাদের কাছে তাদের ক্রমিক সংখ্যা হল ৩, ৬, ৯, ১২, ১৫, ১৮, ২১, ২৪, ২৭ এবং ৩০। আর যারা পেনসিল এনেছিল তাদের ক্রমিক সংখ্যা ২, ৪, ৬, ৮, ১০, ১২, ১৪, ১৬, ১৮, ২০, ২২, ২৪, ২৬, ২৮, ৩০। অর্থাৎ একমাত্র ৩০ তম ছেলেটির কাছেই কম্পাস, রুলার ও পেনসিল— তিনটিই ছিল।

একশো হল শূন্য ছাড়া

সংখ্যাটি হল ৯৯.৯

কারণ, ৯৯.৯ এর মান

$$= \frac{৯৯৯ - ৯৯}{৯} = ১০০$$

অমল ভৌমিক

ইতিহাসের উত্তর তো

ছবি : দেবাশিস দেব

এবার যারা নবম শ্রেণীতে উঠেছ, তাদের মাধ্যমিকের ইতিহাসের পাঠ্যসূচির সঙ্গে পরিচয় করিয়েছেন **সুদেব মুখোপাধ্যায়**

আসলে ধারাবাহিক সময়েরই গল্প

ই তি হা স

মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই পরীক্ষার্থীরা প্রায় মুক্ত, কিন্তু তোমরা যারা অষ্টম ও নবম শ্রেণীতে পড়ছ তারা এবার যথাক্রমে নবম ও দশম শ্রেণীতে উঠবে। তোমাদের পড়াশোনার ভার অনেকাংশে বেড়ে গেল। যদিও এখনও নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়নি। শিক্ষাবর্ষ শুরুর আগেই নবম ও দশম শ্রেণীর সিলেবাস সম্পর্কে যদি সামান্য ধারণা তৈরি হয়ে যায়, তা হলে মন্দ হয় না। মাধ্যমিকের সিলেবাস কেমন, প্রশ্ন কী ধরনের হয়, তার উত্তরই বা লিখতে হয় কীভাবে, তারই সামান্য ভূমিকা করা যাক এ-সংখ্যায়।

ইতিহাস বলতেই অবশ্য তোমাদের চোখ কপালে উঠে যায়।.ওরে বাবা, ইতিহাস! ইতিহাস মানেই তো বেশি পড়া। বেশি লেখা! বেশি লিখেও নম্বর না পাওয়ার আশঙ্কা! সাল, তারিখ, কোটেশন মনে রাখার সমস্যা, মুখস্থ করার সমস্যা! বিজ্ঞান বা অঙ্কের মতো ঠিকঠাক লিখেও যথাযথ নম্বর না পাওয়ার সমস্যা। সমস্যা হরেক রকম। কিন্তু এ-সব আসলে কোনও সমস্যাই নয়। আসলে তোমাদের এই ধারণার পেছনে কিছু পুরনো ভীতি কাজ করে। অনেক সময় তোমরা দাদা, দিদি বা বন্ধুদের কথা শুনে প্রভাবিত হও। এছাড়াও ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার সময়ে ইতিহাসের অনেক কঠিন-কঠিন নাম ও সাল তারিখ মনে রাখতে হয়েছিল, সে-কারণেও এই ধরনের একটা ইতিহাস-বিদ্বেষ হয়তো তৈরি হয়েছে। এর সঙ্গে কাজ করছে বিজ্ঞানের প্রতি ভালবাসা বা অনুরাগ এবং ভবিষ্যতে পরে পড়ার তাগিদ। বিজ্ঞানের যুগে নিশ্চয়ই বিজ্ঞান পড়বে। কিন্তু ইতিহাস সম্বন্ধে তোমাদের এই ধরনের চিন্তাভাবনা একেবারে ভুল। বস্তুত বিজ্ঞানের ন্যায় ইতিহাসেরও একটা উপস্থাপন ভঙ্গী আছে। অল্প কথায় স্বল্প পরিসরে অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে বিষয়বস্তুটি সুন্দর, সাবলীলভাবে উপস্থাপন করলে ইতিহাসে ভাল নম্বর তথা লেটার পাওয়া দুরূহ ব্যাপার নয়। এ ছাড়াও ইতিহাসের সঙ্গে সাহিত্যের নিবিড় সংযোগ আছে। সেক্ষেত্রে ভাষা বা সাহিত্যে ভাল দখল থাকলে ইতিহাসের উত্তর সুন্দরভাবে লেখা সম্ভব। মনে রাখতে হবে, ইতিহাসের উত্তর আসলে একটা ধারাবাহিক সাবলীল গল্প।

ইতিহাসের ক্ষেত্রে সাল, তারিখ, কোটেশন, যুগ মনে রাখাও কোনও জটিল সমস্যা নয়। সাল, তারিখ মনে রাখার জন্য যুগ অনুযায়ী চার্ট তৈরি করা অত্যন্ত প্রয়োজন। যেমন ধরো, প্রাচীন যুগের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি নিয়ে ধারাবাহিকভাবে যুগ অনুসারে কালপঞ্জী তৈরি করলে এ ধরনের জটিলতা থেকে মুক্ত হবে।

এবার তোমাদের নবম-দশম শ্রেণীর ইতিহাসের পাঠ্যসূচি বা সিলেবাসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। মাধ্যমিকের ইতিহাস পাঠ্যসূচি অর্থে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের (১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা পর্যন্ত) ঘটনার ইতিবৃত্ত, এই ইতিহাস তোমাদের অনেকাংশেই জানা, কারণ ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময়ে তোমরা পাঠ্যসূচির কিছু অংশ পড়ে ফেলেছ। তোমরা যারা নবম শ্রেণীতে পড়বে তারা প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ এবং আধুনিক যুগের প্রথম পর্ব, অর্থাৎ ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ পর্যন্ত ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা জানতে পারবে। প্রাচীন ও মধ্য যুগের ইতিহাসের মধ্যে একাধিক সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিই আলোচনার মুখ্য বিষয়বস্তু। এরই সঙ্গে-সঙ্গে অশোক, কণিষ্ক, সমুদ্রগুপ্ত, হর্ষবর্ধন, শশাঙ্ক প্রমুখ প্রাচীনযুগীয় উল্লেখযোগ্য রাজাদের কার্যকলাপও আলোচিত হবে।

১২০৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্যন্ত সময়কাল, মধ্যযুগীয় ইতিহাস বলে বিবেচিত হয়। এ-যুগের ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য সুলতান ও নবাবরা হলেন যথাক্রমে গিয়াসউদ্দিন বলবন, আলাউদ্দিন খলজি, মহম্মদ-বিন-তুঘলক, শেরশাহ, আকবর, শাহজাহান ও ঔরঙ্গজেব। এই সকল নবাব এবং সম্রাটদের কার্যকলাপ আলোচনার সঙ্গে-সঙ্গে বিভিন্ন আঞ্চলিক রাজ্যের উত্থান, বৈদেশিক আক্রমণও হবে আলোচনার বিষয়।

মহাবিদ্রোহের ফলাফল থেকে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত (১৮৫৭-১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ) বিবিধ ঘটনাবলী দশম শ্রেণীর পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুত। এই পর্বের ইতিহাস অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক, বিতর্কিতও বটে। কার্যত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন ধরনের বিদ্রোহ, আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা, সরকারি দমন-পীড়ন প্রভৃতি বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও স্বাধীনতা আন্দোলনে জাতীয় কংগ্রেস, মহাত্মা গাঁধী, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ নেতৃবর্গের কার্যকলাপ ব্যাখ্যা করার সঙ্গে-সঙ্গে মুসলিম লিগ এবং ভারতীয় বামপন্থী দলগুলির কার্যকলাপের বর্ণনা থাকছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ পর্বের ইতিহাস অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের ইতিহাস। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ক্রোধ, ঈর্ষা, জয়ের বাসনা, ক্ষমতা দখল, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণতার অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ দেশবিভাগের পথকে প্রশস্ত করে তোলে। ফলস্বরূপ ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভ করলেও পরিপূর্ণ মুক্তির আস্বাদ মেলেনি। কারণ, তার মধ্যে লুকিয়ে ছিল দেশ-বিভাগের যাতনা। এই সকল ঘটনা উল্লেখের সঙ্গে-সঙ্গে বিভিন্ন আলোচনাকে কেন্দ্র করে একাধিক ঐতিহাসিক গোষ্ঠী যথাক্রমে কেমব্রিজ গোষ্ঠী, দেশীয় ঐতিহাসিক, বামপন্থী ঐতিহাসিক এবং সাব-অলটার্ন মতবাদ (প্রধান প্রবক্তা রণজিৎ গুহ) প্রমুখদের চিন্তাভাবনাও আলোচিত হয়েছে।

পাঠ্যসূচি আলোচনার শেষ পর্বে একথা সহজেই বলা যায় যে, নবম-দশম শ্রেণীর বিষয়বস্তু, আয়তনে যথেষ্টই বড়। এই তিনটি পর্বের ইতিহাস যেহেতু আমাদের দেশের ইতিহাস, যার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, যা আমাদের অতীত গৌরবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়, নিশ্চয়ই সেই ইতিহাস জানার অনুরাগ তোমাদের সকলের আরও প্রবল হবে। আশা রাখি, মাধ্যমিকের পাঠ্যসূচিভিত্তিক ইতিহাস তোমাদের সকলেরই পড়তে ভাল লাগবে।

ইতিহাসের পাঠ্যসূচি সার্বিক আলোচনার সঙ্গে-সঙ্গে তোমাদের মনে নিশ্চয়ই এ-প্রশ্ন জাগে যে, প্রশ্ন কী ধরনের হয়? এসো, তোমাদের সকলের সঙ্গে মাধ্যমিকের বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের পরিচয় করিয়ে দিই। নবম ও দশম শ্রেণীর পরীক্ষায় সাধারণত চার ধরনের প্রশ্ন হয়। প্রথমে, অর্থাৎ ১ নম্বর প্রশ্নে মানচিত্রের মধ্যে স্থান নির্ণয় অথবা দু-এক কথায় নয়টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হয়। এর জন্য ৯ নম্বর থাকে। দুই নম্বর প্রশ্নে দু'টি বিভাগ মিলিয়ে পাঁচটি টীকা লিখতে হয়। প্রতিটি টীকার জন্য তিন নম্বর থাকে। তিন-এর

দাগের দুটি বিভাগ মিলিয়ে ১ নম্বরের ছ'টি রচনাভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর লিখতে হয়। শেষ পর্বে যে কোনও একটা বিষয়ের ওপর প্রবন্ধ রচনা করতে হয়। যার জন্য ১২ নম্বর থাকে। এই প্রশ্নের উত্তরটি অনেকাংশে রচনাভিত্তিক উত্তর।

মাধ্যমিকের ইতিহাসের পাঠ্যসূচি এবং এই পাঠ্যসূচি থেকে কী ধরনের প্রশ্ন আসে তা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর এবার আমরা প্রশ্নের উত্তর কীভাবে লিখবে, তা নিয়ে আলোচনা করব। অর্থাৎ উত্তর লেখার কৌশলটা কী? ইতিহাসের প্রশ্নের ক্ষেত্রে তিন নম্বরের টীকা ছাড়া অধিকাংশ প্রশ্নই রচনাভিত্তিক। এই উত্তর লেখার ক্ষেত্রে সাধারণভাবে ভূমিকা, বিষয়বস্তু (পর-পর অনুচ্ছেদ আকারে) সমালোচনা বা মূল্যায়ন এবং পরিশেষে উপসংহার লিখতে হয়। ৯ ও ১২ নম্বরের উত্তর যথাক্রমে তিন ও চার পাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলেই ভাল। এর বেশিও লিখতে পারো। অসুবিধে নেই। তবে অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, তোমরা অনেক সময় বাড়ির খাতায় বড় করে নোট্‌স লেখো, কিন্তু পরীক্ষার সময় তা যথাযথ লিখতে পারো না। সেজন্য হাতের লেখার গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই উত্তর লেখা বা নোট্‌স লেখা প্রয়োজন।

তোমাদের সুবিধার্থে মাধ্যমিকে যে ধরনের প্রশ্ন আসে প্রধানত সে ধরনের প্রশ্ন ও টীকার পরিপূর্ণ উত্তর আমরা 'লেখাপড়া' বিভাগে আলোচনা করব। মূলত ১০ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় যে ধরনের প্রশ্ন এসেছে তার উত্তরও পাবে। এছাড়াও ক্লাস টেস্ট বা স্কুলের পরীক্ষায় যে ধরনের প্রশ্ন আসে, সে ধরনের উত্তর থাকবে। নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা হয়তো অনেকে লক্ষ করেছ যে, আমরা '৯৯ সালের কয়েকটি সংখ্যায় তোমাদের স্কুলের পরীক্ষার দিকে নজর রেখেই 'আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের ফলাফল', 'কৈবর্ত বিদ্রোহ' প্রভৃতি প্রশ্নের উত্তরও আলোচনা করেছিলাম, যেগুলি সাধারণত মাধ্যমিক পরীক্ষায় বহুদিন আসে না। সে কারণেই বলি, ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। বিগত '৯৬ সাল থেকে আমরা আনন্দমেলার 'লেখাপড়া' বিভাগে ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করছি। বহু ছাত্রছাত্রী গৃহশিক্ষক ছাড়াই কেবল আমাদের উত্তর অনুসরণ করে আশাতীত ফল লাভ করেছে।

তা হলে আমাদের আলোচিত বিভিন্ন উত্তর এবং পরামর্শ অনুযায়ী পড়াশোনার সঙ্গে-সঙ্গে শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকেই কিন্তু তোমাদের পাঠ্য ইতিহাস বইটি ভালভাবে পড়বে। কেবল কয়েকটি টীকা বা বড় প্রশ্নের উত্তর জানলেই ইতিহাসের পাঠ্যসূচি সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা জন্মাবে না। সেক্ষেত্রে পরীক্ষায় ভাল ফল করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা একটা বিষয় নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ যে, প্রতি বছরই মাধ্যমিক পরীক্ষায় কিছু নতুন ধরনের প্রশ্ন আসছে। যেমন, এবারের প্রশ্নে (ইতিহাস-২০০০) তিন-এর 'ঙ' এবং 'চ', যথাক্রমে 'পলাশি ও বক্সারের যুদ্ধের ফলাফল বিশ্লেষণ করো, এবং 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে ভারতের বস্ত্রশিল্পের অবনতির কারণ আলোচনা করো।' এ ছাড়াও, দুই নম্বর প্রশ্নের টীকা পর্বে 'মহম্মদ-বিন-তুঘলকের মুদ্রানীতি বিশ্লেষণ করো', 'নানক', 'ভগিনী নিবেদিতা' প্রমুখ টীকাগুলি আসছে। এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর পাঠ্য ইতিহাস বইটি ভালভাবে পড়া থাকলেই লেখা সম্ভব। কেবল তাই নয়, অবজেকটিভ প্রশ্নের উত্তর লেখার জন্যও ইতিহাস বইটা ভালভাবে পড়া প্রয়োজন। বই না পড়ে কেবলমাত্র পরীক্ষার তাগিদে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করা হল মূর্খামির নামান্তর। সেই জন্যই ক্লাস শুরু হওয়ার সময় থেকেই তোমরা ইতিহাস বইটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়বে।

এছাড়া তোমাদের অভাব-অভিযোগগুলি চিঠির মাধ্যমে আমাদের জানালে, আমরা সময়মতো উত্তর আলোচনা করব। তোমাদের ইতিহাসে ভাল নম্বর পাওয়ানোর দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবেই আমাদের। কী করতে হবে? কী করা প্রয়োজন? কীভাবে উত্তর তৈরি করবে? কেমনভাবে পড়বে, তা আমরা সময়মতো জানাব। তোমাদের দায়িত্ব কেবল আমাদের প্রকাশিত উত্তরগুলি ভালভাবে পড়া, বোঝা এবং তৈরি করা। এর সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর লেখার কৌশল তাড়াতাড়ি রপ্ত করা। তা হলেই দেখবে ইতিহাস আর ভয়ের বিষয়বস্তু হবে না এবং পরীক্ষায় আশাতীত নম্বর পাবে।

(লেখক আমতা পীতাম্বর হাইস্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক)

ভূ গো ল

শুরু হোক নিলনদ দিয়ে

২০০১ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য শুরু হল ভূগোলের ক্লাস। নিলনদ কীভাবে মিশরের প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে সামগ্রিক প্রভাব বিস্তার করেছে, জানিয়েছেন কালিদাস চন্দ

সময় কখনও থেমে থাকে না। এগিয়েই চলে। এমনই করে পার হয়ে চলেছে দিন, মাস, বছর। অতিক্রান্ত হয়েছে অনন্তকাল। সময়কে ধরে রাখা যায় না। আজ যা বর্তমান, আগামীকাল তা অতীত। ২০০০ সালের মাধ্যমিকের পর এগিয়ে এল ২০০১-এর মাধ্যমিক পরীক্ষা। মাঝে আর মাত্র দশটি মাস সময়। এই সময়টাকে কাজে লাগাতে হবে। গোড়া থেকে পরিকল্পনামতো গুছিয়ে কাজ করতে হবে। সময়কে ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে পরে তাড়াহুড়ো করার কোনও প্রয়োজন হবে না।

তোমরা ক্লাস টেন-এ উঠেছ। তোমাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। নতুন বছরের সঙ্গে আমাদের ভূগোল ক্লাস আবার নতুন করে শুরু করা যাক। আজ কোন বিষয়ে আলোচনা করা যায়, জিজ্ঞেস করতেই তামসী ও তমলিকা বলে উঠল, "লন্ডন অববাহিকা সার।"

ভাস্কর ও অরিত্র বলল, "ইউক্রেন অঞ্চল সার।"

তানিয়া ও শরণ্য আবদারের সুরে বলল "নিলনদের অববাহিকা সার।"

অদ্বিতীয়া আর রোশনি যুক্তরাষ্ট্রের হ্রদ অঞ্চল সম্পর্কে আলোচনার জন্য অনুরোধ জানাল।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। সবই আলোচনা হবে। চিন্তার কিছু নেই। এই প্রসঙ্গে একটি কথা তোমাদের জানিয়ে রাখি। মাধ্যমিকের ভূগোল প্রশ্নে 'ঙ' বিভাগটি ক্লাস সিক্স, সেভেন আর এইট-এর নির্বাচিত কিছু বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট। এই বিভাগে দুটির মধ্যে একটি প্রশ্নের উত্তর করতে হয়। একটি প্রশ্ন থাকে সিক্স-এর পশ্চিমবঙ্গের ওপর। আর অন্য প্রশ্নটি থাকে, তোমরা যেসব বিষয়ের উল্লেখ করলে, তা থেকে। অর্থাৎ, সেভেন-এর নিলনদের অববাহিকা, এইট-এর লন্ডন অববাহিকা, ইউক্রেন অঞ্চল ও যুক্তরাষ্ট্রের হ্রদ অঞ্চল।

তোমাদের ইচ্ছে অনুসারে আজ আমরা 'ঙ' বিভাগের দ্বিতীয় প্রশ্নের আলোচনাতে মন দিই। এ-বিষয়ে আসা মাধ্যমিকের গত ১৫ বছরের প্রশ্নগুলি বিষয়ভিত্তিক সাজিয়ে দেওয়া হল। চোখ বুলিয়ে রাখো।

নিলনদের অববাহিকা :

১। মিশরকে 'নিলনদের দান' বলা হয় কেন? ৩ ('86)
২। নিলনদের গতিপথ বর্ণনা করো। ৩ ('89, '99)
৩। নিলনদ কোন সাগরে পতিত হয়েছে? ১ ('87)
৪। মিশরের কৃষিকার্যে সেচের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করো। ৬ ('88)
৫। নিলনদের অববাহিকায় কৃষিতে জলসেচের গুরুত্ব বর্ণনা করো। ৩ ('94)
৬। নিলনদ অববাহিকার কৃষিকার্যে অতীতে বন্যা ও বর্তমানে নদী পরিকল্পনার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৬ ('91)
৭। নিলনদ অববাহিকার কৃষিকার্যে অতীতে প্লাবন ও বর্তমানে খালদ্বারা জলসেচের গুরুত্ব আলোচনা করো। ৬ ('96)
৮। ভৌগোলিক কারণ ব্যাখ্যা করো—'মিশর একটি মরুপ্রায় কিন্তু কৃষিপ্রধান দেশ। ৬ ('98)
৯। নিলনদ অববাহিকার 'সাড' কী? ১ ('94)
১০। মিশরের প্রধান বন্দরটির নাম লেখো। ১ ('97)
১১। নিলনদের ওপর একটি প্রধান বাঁধের নাম করো। ১ ('93, 2000)

লন্ডন অববাহিকা :

১। লন্ডন শহর কোন নদীর তীরে অবস্থিত? ১ ('92, '98)
২। ইংল্যান্ডের কোন অংশ লন্ডন অববাহিকা নামে পরিচিত? ১ ('88)
৩। এই অঞ্চলের উন্নতিতে টেম্‌স নদীর ভূমিকা কী? ৩ ('88)
৪। গ্রিনিচ মান মন্দিরের সঠিক অবস্থান কোথায়? ১ ('99)
৫। লন্ডন অববাহিকার ভূপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো। ৩ ('91)
৬। লন্ডন অববাহিকার সীমা নির্ধারণ করো এবং এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতিতে টেম্‌স নদীর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করো। ৬ ('93)
৭। বন্দর হিসেবে লন্ডনের গুরুত্ব নিরূপণ করো ও লন্ডন অববাহিকার শিল্পসম্পদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ৬ ('95)
৮। লন্ডন শহরের ভৌগোলিক গুরুত্ব নিরূপণ করো। ৩ ('97)
৯। লন্ডন অববাহিকার শিল্প ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ৬ (2000)

ইউক্রেন অঞ্চল :

১। 'ইউক্রেন' শব্দটির অর্থ কী? ১ ('86)
২। ইউক্রেন অঞ্চলের প্রধান নদী কোনটি? ১ ('96)
৩। ইউক্রেনের কৃষির প্রধান বিষয়গুলি উল্লেখ করো। ('93)
৪। ইউক্রেনের কৃষিকার্যের উন্নতি ও কৃষিজ সম্পদের বিবরণ দাও। ৬ ('98)
৫। ইউক্রেনের কৃষি সম্পদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ৩ (2000)
৬। ইউক্রেন অঞ্চলের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কারণগুলি বর্ণনা করো। ৬ ('86)

৭। সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের ইউক্রেন অঞ্চলে কৃষি ও শিল্পের উন্নতির কারণ বর্ণনা করো। ৬ ('89)
৮। ইউক্রেন অঞ্চলের শিল্পোন্নতির কারণ কী? ৩ ('95)
৯। ইউক্রেন অঞ্চলের প্রধান শিল্প কোনটি? ১ ('91)
১০। ইউক্রেনের ধাতুশিল্পের একটি প্রধান কেন্দ্রের নাম করো। ১ ('89)
১১। ইউক্রেন অঞ্চলে জনবসতির ঘনত্ব বেশি কেন? ৩ ('92)

যুক্তরাষ্ট্রের হ্রদ অঞ্চল :

১। আমেরিকার 'বৃহৎ হ্রদ' অঞ্চল বলতে কী বোঝো? ৩ ('87)
২। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কোন অংশ 'হ্রদ অঞ্চল' নামে পরিচিত? ৩ ('90)
৩। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হ্রদ অঞ্চলের তিনটি হ্রদের নাম লেখো। ৩ ('96)
৪। হ্রদ অঞ্চল শিল্পে উন্নত কেন? ৬ ('87)
৫। হ্রদ অঞ্চলের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কারণগুলি কী? ৬ ('90,'99)
৬। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হ্রদ অঞ্চল শিল্প ও কৃষি উভয়ক্ষেত্রেই উন্নত হওয়ার কারণ কী? ৬ ('৯২, '97)
৭। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হ্রদ অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়ে ওঠার কারণগুলি কী? ৬ ('94)
৮। শিকাগো শহর কোন হ্রদের তীরে অবস্থিত? ১ ('৯০, '95)

প্রশ্নগুলি তো সব দেখলে। প্রথমে আমরা **নিলনদের অববাহিকা** বিষয়ে আলোচনা করে নিই।

তানিয়া তুমিই বলো, এই প্রসঙ্গে কোন প্রশ্নের উত্তর আলোচনা করব?

"সার, নিলনদের গতিপথ।"

বেশ, তাই হোক। তাহলে প্রশ্নটি হল, **নিলনদের গতিপথ বর্ণনা করো**। এবার উত্তরটি দেখে রাখো।

• নিলনদ পৃথিবীর একক দীর্ঘতম নদী। এর দৈর্ঘ্য ৬৬৫০ কি.মি। আফ্রিকার মধ্য পূর্বাংশে নিরক্ষরেখার দক্ষিণে টাঙ্গানিকা হ্রদের উত্তরে বুরুন্দির উচ্চভূমি থেকে উৎপন্ন হয়ে উত্তরে প্রবাহিত হয়ে এই নদী ভিক্টোরিয়া হ্রদে এসে পড়েছে। উৎসমুখে এর নাম **কাগেরা** নদী। তারপর ভিক্টোরিয়া হ্রদ থেকে **ভিক্টোরিয়া নিল** নাম নিয়ে এসে পড়েছে অ্যালবার্ট হ্রদে। সেখান থেকে এই নদী **বার-এল জেবেল** ও **বার-এল জেরেফ** নামে দু'টি শাখায় ভাগ হয়ে উত্তরে প্রবাহিত হয়েছে। এরা কিছুটা দূরে মালাকল-এর কাছে আবার একসঙ্গে মিশেছে।

এখানে পশ্চিমদিক থেকে **বার-এল-গজল** এবং পূর্বদিক থেকে **সোবাত** নামে দু'টি উপনদী এসে এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। মালাকল থেকে এই মিলিত প্রবাহ **হোয়াইট নিল** নামে উত্তরে প্রবাহিত হয়েছে। ইথিওপিয়ার পার্বত্য অঞ্চল থেকে উৎপন্ন **ব্লু-নিল** খার্তুম-এর কাছে পূর্বদিক থেকে এর সঙ্গে মিশেছে। খার্তুম-এর পর থেকে ভূমধ্যসাগরের মোহনা পর্যন্ত সম্মিলিত নদীটি **নিলনদ** নামে পরিচিত। পরে পূর্বদিক থেকে **আটবারা** নামে আরও একটি উপনদী এসে নিলনদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এরপর মিশরের মরুভূমির মধ্য দিয়ে সুদীর্ঘ পথ পেরিয়ে নিলনদ কায়রোর কাছে সাতটি ধারায় ভাগ হয়ে এক বিশাল বদ্বীপ সৃষ্টি করে ভূমধ্যসাগরে পড়েছে।

নিলনদের প্রবাহপথ খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ। উৎস থেকে খার্তুম পর্যন্ত নিলনদের উচ্চপ্রবাহ। এর পর আসোয়ান পর্যন্ত মধ্যপ্রবাহ। আর, আসোয়ান থেকে কায়রো পর্যন্ত নিম্নপ্রবাহ এবং কায়রো থেকে মোহনা

পর্যন্ত বদ্বীপ প্রবাহ।

উত্তরটি কি বড় হয়ে গেল?

'না সার, ঠিকই আছে। বিজ্ঞের মতো তাকিয়ে মাথা নাড়ল।

শরণ্য, নিলনদের ওপর তোমার কী জানবার আছে?

'সার কোন-কোন দেশের ওপর দিয়ে নিলনদ প্রবাহিত হয়েছে, তা কি বলার দরকার আছে?

হ্যাঁ তুমি ঠিক জায়গায় ধরেছো। বলতে পারলে তো ভালই হয়। আগের উত্তরের শেষে এইভাবে লিখতে পারো।

• বিশেষ উল্লেখ্য, নিলনদ তাঞ্জানিয়া, কেনিয়া, উগান্ডা, ইথিওপিয়া, সুদান, মিশর প্রভৃতি ছ'টি দেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। নিলনদের বেশিরভাগ অংশই কিন্তু সুদান ও মিশরের ওপর দিয়ে বিস্তৃত।

সার, **মিশরকে 'নিলনদের দান' বলা হয় কেন**, এর উত্তর আলোচনা করবেন? শরণ্য জিজ্ঞেস করল।

নিশ্চয়ই করব। এটি তো খুব ভাল প্রশ্ন। দেখে রাখো এর উত্তর।

• সাহারা মরুভূমি পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত মিশর হল মরুভূমির দেশ। নিলনদের নিম্ন অববাহিকায় অবস্থিত প্রায় সমগ্র মিশর নিলনদের পলি সঞ্চয়েই গড়ে উঠেছে।

এই অঞ্চলে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুবই কম। এরকম শুষ্ক পরিবেশ কৃষির পক্ষে অনুকূল নয়। কিন্তু নিলনদের কল্যাণে মিশর হয়েছে শস্য-শ্যামলা। মিশরের সমগ্র কৃষিভূমিই নিলনদের উপত্যকায় অবস্থিত। আর এই উর্বর ভূমির ওপরই গড়ে উঠেছিল সুপ্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা।

নিলনদ না থাকলে উষর মরুপ্রায়ভূমিতে অবস্থিত মিশর মানুষের বসবাসের অনুপযুক্ত হত। নিলনদ না থাকলে সাহারা মরুভূমি সমগ্র মিশরকে গ্রাস করে ফেলত। কিন্তু নিলনদের জন্যই তা সম্ভব হয়নি।

নিলনদের বিভিন্ন স্থানে বাঁধ দিয়ে সারাবছর ধরে কৃষিজমিতে জলসেচ করা সম্ভব হয়েছে। ফলে প্রচুর পরিমাণে দীর্ঘ আঁশযুক্ত উন্নতমানের তুলোর চাষ হচ্ছে। বিশেষ উল্লেখ্য, মিশরের অর্থনীতি তুলো রফতানির ওপর নির্ভরশীল। এছাড়া প্রচুর পরিমাণে গম, যব, ধান, আখ প্রভৃতি মূল্যবান কৃষিদ্রব্যের চাষ সম্ভব হয়েছে। নিলনদের জন্যই মিশর একটি কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত হয়েছে।

মিশরের নিলনদ উপত্যকার তৃণভূমিতে পশুপালন করা হয়। ফলে বহু মানুষ পশুপালনের মাধ্যমে জীবিকানির্বাহ করেন।

নিলনদের ওপর দিয়ে সারাবছর নৌ-চলাচল করতে পারে। ফলে জল পরিবহণ ও পণ্য পরিবহণে নিলনদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জলসেচের জন্য নির্মিত সেচ বাঁধগুলি থেক উৎপন্ন জলবিদ্যুৎ এই অঞ্চলে শিল্পপ্রসারে সাহায্য করেছে।

রেল ও সড়কপথের বিকাশ হওয়ায় মিশরের পরিবহণ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি ঘটেছে। কৃষি, বিদ্যুৎ, শিল্প, পরিবহণ প্রভৃতির সুবিধে থাকায় নিলনদ অববাহিকা অত্যন্ত ঘন জনবসতিপূর্ণ।

কাজেই মিশরের জলসেচ, কৃষি, পশুপালন, জলবিদ্যুৎ, শিল্প, পরিবহণ জনবসতি প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিলনদের অসামান্য অবদান রয়েছে। এক কথায় নিলনদ মরুভূমির দেশ মিশরকে প্রাণময় করে রেখেছে। এজন্যই গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস বলেছিলেন 'মিশর নিলনদের দান'।

এবার আর একটি প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। প্রশ্নটি হল, **নিলনদ অববাহিকার কৃষিকার্যে অতীতে বন্যা ও বর্তমানে নদী পরিকল্পনার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো**। '৯১ সালে প্রশ্নটি এসেছিল। নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ, '৯৬ সালে আসা প্রশ্নটিও একই রকমের, **নিলনদ অববাহিকার কৃষিকার্যে অতীতে প্লাবন ও বর্তমানে খালদ্বারা জলসেচের গুরুত্ব আলোচনা করো**। দুটি প্রশ্নেরই বক্তব্য এক। কাজেই এদের উত্তরও এক। এবার দেখে নাও উত্তরটি।

• নিলনদের উৎস অঞ্চলে সারা বছরই প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এটি নিরক্ষীয় অঞ্চলের অধীন। মধ্য অববাহিকায় মৌসুমি জলবায়ু দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে বেশি বৃষ্টির জন্য নীলনদে প্রায়ই প্রবল বন্যার সৃষ্টি হত। অতীতে এই প্লাবনের জল নদীর দু' পাড়ের বাঁধে নির্মিত 'স্লুইস গেট' খুলে নিচু প্লাবনভূমিতে পাঠিয়ে দেওয়া হত। ফলে প্লাবনভূমিতে নতুন পলি জমে মাটির উর্বরতা বেড়ে যেত এবং মাটি হত আর্দ্র। এর ফলে ফসলের উৎপাদন প্রচুর বৃদ্ধি পেত। এভাবে প্লাবনের সাহায্যে নিলনদ অববাহিকায় ব্যাপকভাবে কৃষিকাজ করা হত। এখানে উল্লেখ করার, বন্যার সময় ছাড়া বছরের অন্যান্য সময়ে জলের অভাবে কৃষিকাজ সম্ভব ছিল না।

বর্তমানে নদী পরিকল্পনার মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানে সেচ বাঁধ ও জলাধার নির্মাণ করে কৃষিজমিতে সারা বছর জলের যোগান রাখা সম্ভব হয়েছে। এরকম বাঁধ জলাধারের মধ্যে সুদানের সোনার বাঁধ, আটবারা বাঁধ এবং মিশরের আসোয়ান বাঁধ ও নাগ হামদি, আসিয়ুত, ইসনা বাঁধ বিখ্যাত। আর জলাধারের মধ্যে খালাস-এর গিরবা ও লেক নাসের প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। স্থায়ী সেচখাল ছাড়াও নিলনদের বন্যার সময় অনুচ্চ বাঁধ দিয়ে বন্যার জল আটকে রেখে ওই জল সেচের কাজে ব্যবহার করা হয়। এইসব বাঁধ ও জলাধারের সাহায্যে সারা বছর বিশেষ করে শীতকালে কৃষিজমিতে জলসেচ করা হয়।

নিলনদের অববাহিকার উর্বর পলিমাটিতে সেচ বন্যার জলের সাহায্যে খুবই উঁচুমানের দীর্ঘ-আঁশ তুলো, গম, যব, ধান, আখ, তামাক, মিলেট চিনেবাদাম প্রভৃতি ফসলের চাষ করা হয়। কাজেই নিলনদ অববাহিকার কৃষিকাজে অতীতে বন্যা ও বর্তমানে নদী পরিকল্পনার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

নিশ্চয়ই খেয়াল করেছ, প্রশ্নে দু'টি অংশ আছে। প্রথম অংশে অতীতের সেচব্যবস্থা ও দ্বিতীয় অংশে বর্তমানের। দু'টি অনুচ্ছেদে অতীত ও বর্তমানের সেচব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে। আর শেষ অনুচ্ছেদে উপসংহার।

এবার শিল্প জিজ্ঞেস করল। "সার, ভৌগোলিক কারণ ব্যাখ্যা করো, ওই প্রশ্নটা?"

আগে প্রশ্নটি ভাল করে দেখে নেওয়া যাক, **ভৌগোলিক কারণ ব্যাখ্যা করো—মিশর একটি মরুপ্রায় কিন্তু কৃষিপ্রধান দেশ**। কি শিল্পা, তাই তো?

"হ্যাঁ সার।"

বেশ তা হলে তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাক।

• মিশরের নিলনদের অববাহিকার বেশিরভাগ স্থানেই দেখা যায় উষ্ণমরু প্রকৃতির চরম জলবায়ু। শীত ও গ্রীষ্মের মধ্যে, এমনকী দিন-রাতের মধ্যেও উষ্ণতার খুব বেশি পার্থক্য এবং খুবই কম বৃষ্টিপাত ও অনিশ্চিত বৃষ্টিপাত এখানকার জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। মিশরের গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন গড় তাপমাত্রা যথাক্রমে প্রায় ৪০°-৫০° সেলসিয়াস ও ১৫°-২০° সেলসিয়াস। দেশের মোট আয়তনের প্রায় ৯৫ শতাংশ অঞ্চলই বৃষ্টিহীন। তাই মিশর একটি মরুপ্রায় দেশ।

কিন্তু তবুও মিশর একটি কৃষিপ্রধান দেশ। নিলনদের উৎস অঞ্চলে সারা বছরই প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এ ছাড়া মধ্য অববাহিকায় মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাবে গ্রীষ্মকালে প্রবল বৃষ্টির জন্য মিশরে দারুণ বন্যা দেখা যায়। এর ফলে নদী অববাহিকা অঞ্চল খুবই উর্বর থাকে। বর্তমানে মিশরে বিভিন্ন বহুমুখী নদী পরিকল্পনার সাহায্যে বিভিন্ন সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে সারা বছরই চাষাবাদ করা হয়ে থাকে। ফলে উন্নতমানের তুলো, গম, যব, ধান, আখ, তামাক, মিলেট, চিনেবাদাম প্রভৃতি ফসল উৎপাদনে মিশর উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে। এই কারণের জন্যই বলা হয়, **মিশর একটি মরুপ্রায় কিন্তু কৃষিপ্রধান দেশ।**

আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করা যাক। পরের বার লন্ডন অববাহিকা, ইউক্রেন ইত্যাদি প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাবে। সময়ের কাজ সময়ে করে ফেলবে। কোনও কিছুই পরে করব বলে রেখে দেবে না।

(লেখক দ্য পার্ক ইনস্টিটিউশন-এর ভূগোলের শিক্ষক)

'রাইটিং স্কিল' বিভাগে 'স্টোরি রাইটিং'-সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর কীভাবে লেখা উচিত, উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন

রণধীর ভট্টাচার্য

গল্প লেখাও শেখার জিনিস

ইংরেজি

এবার আর পড়াশোনা নয়, স্রেফ গল্প। কিন্তু দাঁড়াও, পড়াশোনা নয় শুনে অত উৎসাহিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ গল্পটাও তোমাদের সিলেবাসেরই অঙ্গ। গল্প মানে, 'স্টোরি রাইটিং'। কীভাবে স্টোরি ডিভেলপ করতে হয়, সেটাও কিন্তু শেখার জিনিস। স্টোরি রাইটিং-এর ওপরে প্রশ্ন থাকলে, যে পয়েন্টগুলো দেওয়া থাকবে তার ওপরে ভিত্তি করেই উত্তর লিখতে হবে। সাধারণত 120 শব্দের মধ্যেই গল্পটি লিখতে হবে এবং গল্পের একটি নাম দিতে হবে। যদি কোনও নীতিবাক্য থাকে, তা হলে নীচে তাও লিখবে।

Q. Develop in about 120 words the points below into a story. Add a moral to it:

War between England and France—an English soldier—taken prisoner in France for years—war ends—becomes free—returns to his native land—notices a bird—seller—buys all the birds—opens the cage—sets the birds free-feelings of imprisonment.

Ans : Title : **An English War Prisoner**

Once, England and France were engaged in a war. The war continued for a long time. Then an English soldier was taken to Paris as a war-prisoner. He was put into a prison. There the young man had a miserable experience. He longed for freedom. Then the war ended and the English man was released. He came back to England. There, one day, the English soldier went to a market and saw a bird-seller selling birds in a cage. He bought all the birds. Then he opened the door of the cage and set the birds free. The bird-seller was astonished and asked the man, "why do set all the birds free?" The English man replied, "I know the pain of imprisonment. So, I have set the birds free."

Moral : The wearer knows, where the shoe pinches.

Q No. (2) : A man and a child walking with a donkey—some passers by remarked— "The man is a fool he does not ride the donkey."—the man rides the animal—some people comment "The man is cruel, small child walking and he is riding"—the man takes up the child on the donkey—the passers by comment, "the man is cruel—the poor animal is tortured—then the man and the

In a certain village of West Bengal, a man lived. He had a donkey. One day, he was walking with his child and the donkey. Some passers by saw them and remarked, "What a fool is this man! He can easily ride the donkey." The man heard the comment and rode on the donkey. Then they were proceeding on the way. Some people saw the man riding the donkey and the child walking by his side. They remarked, "The man is cruel. He is riding the donkey and the child in walking." Hearing this, the man took up the child by his side on the donkey. They were proceeding on the way. Seeing this, another pedestrian remarked, "How cruel these people are! the poor animal is tortured." Then both the man and the child got down from the donkey. They carried the donkey on their shoulders. On the way, there was a river. As they came on the bridge, the donkey was upset. It jumped into the river. The poor man lost the donkey.

Moral : Its foolishness to act on other's comment.

Q No. (3) A proud jackdaw—he sees two peacocks dancing—looks at a water-pool—sees his image—dislikes it—wants to be a peacock—with feathers of peacock he makes the make-up—joins a group of dancing peacocks—but he is deterted—thrown out—he comes back to join jackdaw , friends—but his friends also made him an outcaste.

Ans : The jackdaw and the Peacock

Once upon a time, a jackdaw lived in a forest. He was dissatisfied with his own people. He wanted to imitate others. In the rainy season, the peacocks of the forest started dancing seeing the clouds in the sky. The jackdaw saw his own image in a pool. He did not like his own appearance. He wanted to be a beautiful bird like a peacock. So, he collected some colourful feathers of peacocks and dressed himself like a peacock. Then he went to a group of dancing peacocks. He mixed with them and started dancing. But soon he was detected and thrown out by the peacocks. Then the jackdaw came back in this own group. But they also drove him out as an outcaste who had once forsaken their company.

Moral : It is better to live among our own people with dignity than to imitate others way of life.

Develop the following points into a story

(A) A couple of crows living on a tree—witty and mischievous—a white heron makes friends with them—crow promises food and comfort—they live together—hunter sleeps under the tree—crow throws excreta ----- falls in hunder's mouth—hunter becomes angry—he shoots an arrow up—strike heron who dies.

(B) Late evening — you send your brother into the bedroom to bring something — he comes out running, afraid and believes to have heard the voice of the ghosts — disbelieving, you go in and hear some voice in whisper, cries and songs — afraid but you try to find out the source of the voice — the voice comes from within the almirah — with great courage you open the almirah and discover the source of the 'ghost-voice' as the transistor is not switched off.

Ans : Title : **Ghost-Voice**

Last evening, I was reading in my study. I asked my younger brother to fetch me my globe from the bedroom. He went inside the room but rushed out of the room immediately, I asked him , "what is the matter? you seem to be scared." "Yes," replied my brother, "I have heard the voice of the ghosts in that room." Hearing this, We went into the room and heard some voices in whisper, cries and songs. I was afraid but took courage and determined to find out the source of the ghost-voice. I looked in all corners of the room and found that the voice was coming from within the almirah. With great courage, I opened the almirah and discovered the source of the ghost voice as the transistor was not switched off.

Q (C) Holding a piece of meat in its mouth, a dog waited to eat it in a quiet place — it had to cross a stream — from the bridge it looked down and saw its own reflection — it saw another dog with the same piece of meat — it wanted to get it — it barked — the piece of meat fell into the water.

Ans : Title : **The Greedy Dog**

Once, a dog stole a piece of meat from a butcher's shop. It decided to eat the meat in a quiet place. So, holding the piece of the meat in its mouth it walked over a bridge on a stream. Suddenly, it looked down and saw its own reflection in the water of the river. The dog thought that it was another dog holding a piece of meat in its mouth. The greedy dog wanted to get it. It barked and the piece of meat fell into the water.

Q (D) A criminal employs a gardener — gardener knows of the crimes — the employer threatens to kill him — the gardener leaves a clue before he is killed — a famous detective finds out that the gardener was killed by his employer — the detective explains the clue — the gardener had sown the plants in such a manner that they made the sentence — "My master is a wicked criminal. If I am killed he should be caught, for he does not want a witness to his crime to him." — every one admires the detective's power of observation.

Ans : Title : **An Intelligent Gardener and a Criminal Employer**

Once upon a time, a wicked criminal operated from the city of Mumbai. He had a beaufiful cottage with a large garden of flowers. He engaged a gardener to look after the garden. In a very short time, the gardener understood that his master was a criminal and he carried on smuggling business. His associates used to come to that cottage. Subsequently the employer understood that his gardener had known a lot about his secret illegal business. He threatened the gardener, "If you inform the police, you will be killed." Now, the gardener was sure that he would be killed soon. So, he planted the flower-plants in rows through which he wrote this sentence : "My master is a wicked criminal. If I am killed he should be caught, for he does not want a witness to his crime to him." Then the gardener was killed. A detective was appointed to reveal the mystery of the murder. He inspected the garden and then arrested the employer. To the higher officials of the police department, the detective explained the clue left by the intelligent gardener. The government rewarded the detective for his keen observation and sanctioned compensation to the nearest relative of the gardener who was brutally killed.

Q. Develop the following outlines and write a story (in about 120 words) and give a title and a moral to it.

An old man gave an idol to his son and asked him to worship it — the son obeyed for years — no blessings — broke the idol in anger — found a large treasure inside.

(লেখক হিন্দু স্কুলের প্রাক্তন প্রধানশিক্ষক)

ভৌ ত বি জ্ঞা ন

তরলের আবার গলনাঙ্ক হয় নাকি

এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার ভৌতবিজ্ঞানের প্রশ্নপত্র থেকে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর ধরে-ধরে আলোচনা করেছেন সুখেন্দু মাইতি

মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ— তোমাদেরও শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের ক্ষণিক বিরাম। তোমরা যারা আনন্দমেলায় প্রকাশিত আলোচনা অনুসরণ করে তৈরি হয়েছ ও পরীক্ষা দিয়েছ, আমার বিশ্বাস, তারা নিশ্চয়ই ভৌতবিজ্ঞানে লেটার মার্ক্স পাবে। এখন শান্ত মনে বসে ভৌতবিজ্ঞান পরীক্ষা কেমন দিয়েছ, পরীক্ষায় আসা প্রশ্নগুলির সঠিক এবং যথাযথ উত্তর ঠিকমত লিখতে পেরেছ কিনা, বা কীভাবে প্রশ্নগুলির উত্তর দিলে আরও বেশি নম্বর পাওয়া যেতে পারত—তোমাদের এই আত্মসমীক্ষায় একটু সাহায্য করার জন্য এই সংখ্যায় প্রশ্নগুলির উত্তর নিয়ে

সামান্য আলোচনা করা যাক।

প্রথমে প্রশ্নপত্রের 'ক'-বিভাগের প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করছি। এই বিভাগ থেকে কমপক্ষে দুটি, সর্বাধিক চারটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়।

1. শক্তির নিত্যতা নীতিটি কী?

পৃথিবীতে লভ্য বিভিন্ন প্রকার শক্তির মূল উৎসটি কী তা ব্যাখ্যা করে বলো।

সকল প্রকার শক্তিই শেষ পর্যন্ত কোন শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়? 2 + 2 + 1

প্রথম অংশের উত্তরে, বুঝতেই পারছ, শক্তির নিত্যতা সূত্রটি লিখতে হবে। দ্বিতীয় অংশের উত্তর হল— পৃথিবীতে লভ্য বিভিন্ন প্রকার শক্তির মূল উৎসটি হল সূর্য। সূর্য থেকে যে শক্তি পৃথিবীতে আসে তা হল প্রধানত তাপশক্তি এবং আলোকশক্তি।

(i) সূর্যের তাপশক্তি দ্বারা সমুদ্র এবং অন্যান্য জলাশয়ের জল বাষ্পীভূত হয়ে মেঘে পরিণত হয়। মেঘ বৃষ্টি রূপে মাটিতে ঝরে পড়ে, পর্বতচূড়ায় বরফরূপে জমা হয়। সূর্যের কিরণে ওই বরফ গলে যায় এবং বরফ-গলা জল নদীরূপে সমতলে নেমে আসে। পার্বত্য নদীর তীব্র জলস্রোত অথবা নদীতে বাঁধ দিয়ে ওই বাঁধের জল ছেড়ে যে তীব্র জলস্রোতের সৃষ্টি হয়, সেই তীব্র জলস্রোতের গতিশক্তি দ্বারা ডায়নামো চালিয়ে তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। এই তড়িৎশক্তি আমাদের নিত্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত অন্যান্য শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়।

(ii) উদ্ভিদ সূর্যকিরণের উপস্থিতিতে সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়া দ্বারা নিজের খাবার তৈরি করে নিজ দেহ পুষ্ট করে।

এক্ষেত্রে সৌরশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে উদ্ভিদ দেহে সঞ্চিত থাকে। এই শক্তি কাঠ পোড়ালে তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

(iii) উদ্ভিদ বা উদ্ভিদ দ্বারা পুষ্ট প্রাণীর দেহ মাটির নীচে হাজার-হাজার বছর ধরে চাপা থাকায় যথাক্রমে কয়লা ও খনিজ তেলে পরিণত হয়। এই ভাবে উৎপন্ন কয়লা ও খনিজ তেল থেকে যে বিপুল পরিমাণ তাপশক্তি পাওয়া যায়, সেই তাপশক্তিকে রূপান্তরিত করে প্রয়োজনীয় অন্যান্য শক্তিগুলি পাওয়া যায়।

(iv) ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র সূর্যের তাপ সমানভাবে না পাওয়ার ফলে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। এই বায়ুপ্রবাহ দ্বারা কল চালিয়ে যান্ত্রিক শক্তি এবং অন্যান্য শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়।

(v) বর্তমানে সৌরশক্তিকে সরাসরি তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরিত করা হয় সৌর কোষের সাহায্যে।

(vi) সৌরশক্তিকে তাপশক্তিতে রূপান্তরিত করা হয় সৌরচুল্লীতে।

(vii) বর্তমানে সমুদ্রের জোয়ার ভাটার শক্তিকে অন্যান্য শক্তিতে রূপান্তরিত করার চেষ্টা চলছে। জোয়ার ভাটার সৃষ্টিতে সূর্যের মহাকর্ষ বলের ভূমিকা আছে।

সুতরাং দেখা গেল পৃথিবীতে লভ্য বিভিন্নপ্রকার শক্তির মূল উৎস হল সূর্য।

তৃতীয় প্রশ্নটির উত্তর হল— সব শক্তিকে শেষ পর্যন্ত তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হতে হয়।

(b) **মৌল একক ও লব্ধ একক বলতে কী বোঝো? উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করো।**

এখানে মৌল বা মূল একক এবং লব্ধ এককের সঠিক সংজ্ঞা দিয়ে উদাহরণ দিতে হবে। লব্ধ এককের উদাহরণে দেখাতে হবে যে লব্ধ এককটি এক বা একাধিক মূল এককের সাহায্যে গঠিত হয়।

(c) **সাধারণ তুলার সুবেদিতা বলতে কী বোঝায়, ব্যাখা করো।**

উত্তর হল— যে তুলা দ্বারা ভরের সামান্য পার্থক্য মাপা যায়, তাকে সুবেদি তুলা বলে। তুলাকে সুবেদী করতে হলে,— (i) তুলা দণ্ডের বাহু দুটিকে দীর্ঘ হতে হবে, (ii) তুলা দণ্ডটিকে হালকা হতে হবে, সূচকটির দৈর্ঘ্য বাড়াতে হবে এবং দণ্ডের ভারকেন্দ্র ও আলম্ব বিন্দুর মাঝের দূরত্ব যতদূর সম্ভব কম হতে হবে।

2 (a) $^{235}_{92}A$ এবং $^{238}_{92}B$ — এই দুটি পরমাণুর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কী? পরমাণুদ্বয়ের প্রতিটিতে কয়টি প্রোটন এবং কয়টি নিউট্রন বর্তমান?

এর উত্তরটি হল— $92A^{325}$ এবং $92B^{238}$ পরমাণু দুটির পারমাণবিক সংখ্যা = 92 অর্থাৎ সমান, কিন্তু ভর সংখ্যা পৃথক। সুতরাং পরমাণু দুটি একই মৌলের আইসোটোপ।

$92A^{235}$ পরমাণুটির প্রোটন সংখ্যা = 92 নিউট্রন সংখ্যা = (235-92) = 143 এবং $92B^{238}$ পরমাণুটির প্রোটন সংখ্যা = 92, নিউট্রন সংখ্যা = (238-92) = 146

(b) কোনও মৌলের ভর সংখ্যা এবং পারমাণবিক ওজনের মধ্যে পার্থক্য কী? কোনটির মান প্রায় সবক্ষেত্রেই উচ্চতর হয় এবং কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর হল :

(i) কোনও মৌলের ভরসংখ্যা হল পরমাণুটির নিউক্লিয়াসে অবস্থিত প্রোটন এবং নিউট্রনের মোট সংখ্যা।

কোনও মৌলের একটি পরমাণু, একটি অক্সিজেন পরমাণুর ভরের 1/16 অংশের চেয়ে যতগুণ ভারী, সেই সংখ্যাটি হল ওই মৌলের পারমাণবিক ওজন।

(ii) ভর সংখ্যা কখনও ভগ্নাংশ হয় না, সর্বদা পূর্ণ সংখ্যা হয়। পারমাণবিক ওজন পূর্ণ সংখ্যা হতেও পারে, নাও হতে পারে।

(iii) যে সব মৌলের আইসোটোপ নেই তাদের ভর সংখ্যা এবং পারমাণবিক ওজন সমান হয়।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মৌলের পারমাণবিক ওজন ওর ভর সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়। এর কারণ হল, বেশিরভাগ মৌলের পারমাণবিক ওজন হল, প্রকৃতিতে বিভিন্ন অনুপাতে পাওয়া মৌলটির আইসোটোপগুলির ভর সংখ্যার গড় হিসেব। তাই মৌলের ভরসংখ্যার চেয়ে ওর পারমাণবিক ওজন সাধারণত বেশি হয়। যেমন, Cl-র ভর সংখ্যা 35, কিন্তু ওর পারমাণবিক ওজন হল 35.5।

(c) পরমাণুতে বিভিন্ন কক্ষে আবর্তনরত ইলেকট্রনসমূহ এবং সৌরজগতে আবর্তিত গ্রহগুলির মধ্যে তিনটি পার্থক্যের উল্লেখ করো।

উত্তর : পরমাণুর কক্ষে আবর্তনরত ইলেকট্রন এবং সৌরজগতে আবর্তিত গ্রহের মধ্যে পার্থক্য—

(i) সৌরজগতে সূর্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গ্রহগুলি আবর্তন করে মহাকর্ষ বলের প্রভাবে।

পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ইলেকট্রনগুলি আবর্তন করে স্থির তড়িৎ আকর্ষণ বলের প্রভাবে।

(ii) সৌরজগতে বিভিন্ন গ্রহের আয়তন এবং ভর বিভিন্ন। পরমাণুতে প্রত্যেকটি ইলেকট্রনের ভর এবং আয়তন সমান।

(iii) সৌরজগতে একটি কক্ষে কেবল মাত্র একটি গ্রহ থাকে। পরমাণুতে কোন কক্ষপথে একটি অথবা তার বেশি সংখ্যক ইলেকট্রন থাকে।

3 (a) কুয়াশা কী? শহর অঞ্চলে প্রায়ই কুয়াশা দেখা যায় কেন?

কুয়াশা : ভূপৃষ্ঠের ওপর অনেকখানি জায়গা জুড়ে বায়ুর উষ্ণতা কমে গেলে, ওখানকার বায়ু ওর মধ্যস্থ জলীয় বাষ্প দ্বারা ক্রমশ সম্পৃক্ত হতে থাকে। বায়ুর উষ্ণতা শিশিরাঙ্কের নীচে নেমে গেলে, ওই সম্পৃক্ত বায়ু থেকে কিছু পরিমাণ জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে, বায়ুর মধ্যে ভেসে থাকা সূক্ষ্ম ধূলিকণার গায়ে জমে জলবিন্দুর আকারে বাতাসে ভেসে বেড়ায়। একেই কুয়াশা বলে।

শিল্পাঞ্চলে বায়ুর মধ্যে ভেসে থাকা ধূলিকণা বা সূক্ষ্ম কয়লার কণার পরিমাণ বেশি থাকে। এখন বায়ুর উষ্ণতা শিশিরাঙ্কের নীচে নেমে গেলে, জলীয় বাষ্প দ্বারা সম্পৃক্ত বায়ুর কিছু অংশ ভেসে বেড়ানো ওই ধূলি ও কয়লা কণাগুলির ওপর সহজেই জমে কুয়াশার সৃষ্টি করে। তা ছাড়া শিল্পাঞ্চল ঘন বসতিপূর্ণ হওয়ায় বায়ুপ্রবাহ কম হয়, ফলে বেশি কুয়াশা

জমার সুযোগ পায়।

(b) ধাতুর পাত্র অপেক্ষা মাটির কলসিতে জল রাখলে ঠাণ্ডা থাকে কেন?

উত্তর : ধাতুর পাত্রে রাখা জলের চেয়ে মাটির কলসিতে রাখা জল বেশি ঠাণ্ডা হয়। কারণ, মাটির কলসির গায়ে অসংখ্য সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে। কলসিতে রাখা জল ওই ছিদ্রগুলি দিয়ে বাইরের গায়ে চলে আসে এবং ওই কলসী থেকে প্রয়োজনীয় লীন তাপ সংগ্রহ করে বাষ্পীভূত হয়ে যেতে থাকে। এর ফলে কলসি এবং ওর মধ্যস্থ জল ঠাণ্ডা হয়।

ধাতুর পাত্রের গায়ে ওই রকম সূক্ষ্ম কোনও ছিদ্র থাকে না। তাই পাত্রের জল পাত্রের গা বেয়ে বাইরে এসে বাষ্পীভূত হওয়ার সুযোগ পায় না বলে ওই পাত্রের জল ঠাণ্ডা হয় না।

(c) আদর্শ গ্যাস কাকে বলে? প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ বলতে কী বোঝো?

উত্তর : আদর্শ গ্যাস : যে গ্যাস, গ্যাসের অবস্থার সমীকরণ $PV = RT$ পুরোপুরি মেনে চলে তাকে আদর্শ গ্যাস বলে।

প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ : সমুদ্রপৃষ্ঠে 760 মিমি পারদস্তম্ভের চাপকে প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ বলে ধরা হয়। এর মান নীচে দেওয়া হল।

এখন পারদের ঘনত্ব = 13595 কিলোগ্রাম/ ঘন মিটার

অভিকর্ষজ ত্বরণ = 9.8 মিটার/সেকেন্ড^2।

সুতরাং 760 মিমি বা 0.76 মিটার পারদ স্তম্ভের চাপ = উচ্চতা $\times$ ঘনত্ব $\times$ অভিকর্ষজ ত্বরণ

$0.76 \times 13595 \times 9.8 = 101255.6$ নিউটন $\times$ মিটার^2

9 (a) তরলের গলনাঙ্ক কাকে বলে? বাষ্পায়ন এবং স্ফুটনের মধ্যে পার্থক্য কী?

এখানে প্রশ্নটিতে ত্রুটি আছে— হবে 'তরলের স্ফুটনাঙ্ক' অথবা **'কঠিনের গলনাঙ্ক'** কাকে বলে। সংজ্ঞাটি সঠিক লিখতে হবে।

বাষ্পায়ন এবং স্ফুটনের মধ্যে পার্থক্য : কম পক্ষে পাঁচটি পার্থক্য উল্লেখ করতে হবে।

(b) প্রেশার কুকারে তাড়াতাড়ি রান্না হয় কেন?

উত্তর : প্রমাণ চাপে বিশুদ্ধ জলের স্ফুটনাঙ্ক 100°C। কোনও উপায়ে জলের উপরিভাগে চাপ বাড়ালে দেখা যায় 100°C-এর বেশি উষ্ণতায় জল ফুটছে। প্রেশার কুকার যন্ত্রে জলীয় বাষ্পকে পাত্রের ভেতরে আবদ্ধ রেখে জলের ওপর চাপ বাড়ানো হয়, ফলে 100°C উষ্ণতার চেয়ে অনেক বেশি উষ্ণতায় জল ফুটতে থাকে অর্থাৎ চাপ বাড়ানোর ফলে জলের স্ফুটনাঙ্ক বেড়ে যায়। এর ফলে এই যন্ত্রে তাড়াতাড়ি রান্না হয়।

(c) হাইড্রোজেন পরমাণুর দুটি সমস্থানিকের নাম করো এবং কোনটিতে কয়টি নিউট্রন আছে বলো।

উত্তর : হাইড্রোজেন পরমাণুর দুটি সমস্থানিকের নাম হল ডয়টেরিয়াম এবং ট্রাইটিয়াম। ডয়টেরিয়ামের পরমাণুতে একটি এবং ট্রাইটিয়ামের পরমাণুতে দুটি নিউট্রন থাকে।

'খ' বিভাগ

এই বিভাগে থেকে কমপক্ষে তিনটি এবং সর্বাধিক পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়।

5 (a) সরণ ও ত্বরণের সংজ্ঞা লেখো। রাশিদুটির প্রত্যেকের সি.জি এস এবং এফ. পি. এস এককের নাম লেখো।

উত্তর : সরণ এবং ত্বরণের সঠিক সংজ্ঞা লিখতে হবে। সরণের সি. জি. এস. একক হল সেন্টিমিটার এবং এফ. পি. এস একক হল ফুট। ত্বরণের সি. জি. এস. একক হল সেন্টিমিটার/সেকেন্ড^2 এবং এফ. পি. এস একক হল ফুট সেকেন্ড^2।

(b) একটি ট্রেন 5 ফুট/সেকেন্ড^2 ত্বরণ নিয়ে কোনও স্টেশন থেকে যাত্রা আরম্ভ করল। 6 মিনিটে ট্রেনটি কত দূর যাবে?

উত্তর : এখানে ট্রেনের প্রাথমিক বেগ $u = 0$, ত্বরণ $f = 5$ ফুট/সেকেন্ড^2

সময় $t = 6$ মিনিট $= 6 \times 60 = 360$ সেকেন্ড,

অতিক্রান্ত দূরত্ব $s =$ কত?

আমরা জানি $s = ut + \frac{1}{2}ft^2$, সমীকরণটিতে মানগুলি বসিয়ে,

$s = 0 \times 360 + \frac{1}{2} \times 5 \times (360)^2$

বা $s = 324000$ ফুট $= 108000$ গজ $= 61.36$ মাইল

(c) নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র বিবৃত করো। ভরবেগ এবং বলের মধ্যে সম্পর্ক কী? সি. জি. এস এবং এফ. পি. এস. পদ্ধতিতে বলের চরম এককের সংজ্ঞা দাত্ত এবং নাম লেখো।

উত্তর : ভরবেগ এবং বলের সম্পর্ক : নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র অনুযায়ী ভরবেগের পরিবর্তনের হার প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক হয়।

ধরি একটি বস্তুর ভর = m, বস্তুটির প্রাথমিক বেগ = u, বস্তুটি ওপর t সময় ধরে বস্তুটির গতির অভিমুখে p মানের বল প্রয়োগ করা হল। এর ফলে t সময় পর শেষ বেগ = v হল।

প্রাথমিক ভরবেগ = mu, শেষ ভরবেগ = mv

t সময়ের মধ্যে ভরবেগের পরিবর্তন = mv - mu

ভরবেগের পরিবর্তনের হার = (mv-mu)/t

দ্বিতীয় সূত্রানুযায়ী, ভরবেগের পরিবর্তনের হার প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক হয়, অর্থাৎ,

$P \propto (mv-mu)/t$

বা, $P = k\ (mv-mu)/t$ (k ধ্রুবক)

$P = (mv-mu)/t$ [K-এর মান সুবিধাজনকভাবে]

বা $P \times t = mv - mu$

অর্থাৎ বল $\times$ সময় = ভরবেগের পরিবর্তন

সি.জি.এস পদ্ধতিতে বলের এককের সংজ্ঞা ও নাম তোমাদের জানা। তবে এফ.পি.এস পদ্ধতিতে তোমাদের অনেকেই বলের এককের নাম ও সংজ্ঞা জানো না— কারণ, 7.1.92 তারিখে মধ্য শিক্ষা পর্ষৎ-এর সচিব জানিয়েছেন যে, এর পর থেকে বিজ্ঞান বিষয়ক সব পাঠ্যপুস্তকে একমাত্র এস. আই ইউনিট আবশ্যিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। তাই বেশির ভাগ পাঠ্যপুস্তকে এফ.পি.এস. পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়নি।

যাই হোক বলের এফ.পি.এস একক হল— **পাউন্ডাল**।

সংজ্ঞা : এক পাউন্ড ভরের কোনও বস্তুর ওপর যে বল প্রয়োগ করলে এক ফুট/সেকেণ্ড^2 ত্বরণ সৃষ্টি হয়, সেই বলকে এক পাউন্ডাল বলে।

(b) 500 গ্রাম ভরের কোনও বস্তুতে ২ মিটার/সেকেণ্ড^2 ত্বরণ সৃষ্টি করতে করতে কত নিউটন বল প্রয়োগ করতে হবে?

উত্তর : এখানে ভর $m = 500$ গ্রাম $= 500/1000 = 0.5$ কিলোগ্রাম

ত্বরণ $f = 2$ মিটার/সে^{2}, প্রযুক্ত বল $P =$ কত?

আমরা জানি $P = m \times f$, মানগুলি বসিয়ে,

$P = 0.5 \times 2 = 1$ নিউটন।

(c) দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভারের কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করো।

উত্তর : এক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভারের ছবি এঁকে ওই লিভারের কার্যপ্রণালী বোঝাতে হবে। এখানে দেখানো হল—

দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভারে আলম্বের যেদিকে ভার থাকে, সেই দিকেই আরও দূরবর্তী একটি বিন্দুতে ভারের অভিমুখের বিপরীতদিকে বল প্রয়োগ করা হয়।

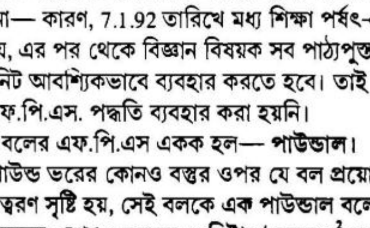

কার্যনীতি : চিত্রে AO—একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভারের আলম্ব বিন্দু হল O. এই লিভারের B এবং A বিন্দুতে যথাক্রমে W ভার এবং P বল

প্রয়োগ করা হয়েছে। এখানে BO = রোধবাহু, AO = বলবাহু। এখন বলবিদ্যার সূত্রানুযায়ী লিভারের সাম্যাবস্থায়,
প্রযুক্ত বল × বলবাহু = ভার × রোধবাহু
বা $P \times AO = W \times BO$
সুতরাং লিভারের যান্ত্রিক সুবিধা = W/P = AO/BO, যেহেতু বলবাহু AO, রোধ বাহু BO-এর চেয়ে বড়, তাই দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভারে যান্ত্রিক সুবিধা W/P সব সময় 1-এর বেশি হয়।

7(a) আপেক্ষিক তাপের সংজ্ঞা লেখো। একই উষ্ণতায় এক গ্রাম লোহা এবং এক গ্রাম তামা কি একই পরিমাণ তাপ ধারণ করে? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর : আপেক্ষিক তাপের সংজ্ঞা— পাঠ্য বই দ্যাখো।
যেহেতু কোনও বস্তু দ্বারা গৃহীত বা বর্জিত তাপের পরিমাণ বস্তুটির উপাদান তথা বস্তুটির উপাদানের আপেক্ষিক তাপের ওপর নির্ভর করে, তাই তামা ও লোহার ভর এবং উষ্ণতা সমান হলেও ওদের আপেক্ষিক তাপ বিভিন্ন হওয়ার জন্য একই পরিমাণ তাপ ধারণ করবে না।

(b) 418 জুল যান্ত্রিক শক্তি তাপে রূপান্তরিত হলে, কত ক্যালোরি তাপ উৎপন্ন হবে?

উত্তর : আমরা জানি তাপের যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক = 4.18 জুল/ক্যালোরি অর্থাৎ, 4.18 জুল পরিমাণ যান্ত্রিক শক্তি তাপে রূপান্তরিত হলে 1 ক্যালোরি তাপ উৎপন্ন হয়।
সুতরাং 418 জুল পরিমাণ যান্ত্রিক শক্তি তাপে রূপান্তরিত হলে 418/4.18 = 100 ক্যালোরি তাপ উৎপন্ন হবে।

(c) কোন উষ্ণতায় সেলসিয়াস এবং ফারেনহাইট স্কেলের পাঠ সমান হবে?

উত্তর : ধরি সেলসিয়াস স্কেলে পাঠ $C = x^\circ$ $\therefore$ ফারেনহাইটে স্কেলে পাঠ $F = x^\circ$ হবে।
এই মানগুলি $C/5 = (F-32)/9$ সমীকরণে বসিয়ে,
$x/5 = (x-32)/9$ বা $9x = 5x - 160$
বা, $x = 40^\circ$
$-40^\circ C$ উষ্ণতায় সেলসিয়াস এবং ফারেনহাইট স্কেলের পাঠ এক হবে।

8(a) তড়িৎ চুম্বক কী? এর দুটি ব্যবহারের উল্লেখ করো।

উত্তর : তড়িৎ চুম্বকের সংজ্ঞা দাও। ব্যবহার পাঠ্য পুস্তক দ্যাখো।

(b) শ্রুতিমধুর শব্দের বৈশিষ্ট্যগুলির নাম লেখো।

উত্তর : শ্রুতিমধুর শব্দের তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকে— যথা
(1) প্রাবল্য, (2) তীক্ষ্ণতা এবং (3) গুণ বা জাতি

(c) ক্ষণস্থায়ী শব্দের প্রতিধ্বনি শোনার জন্য উৎস থেকে প্রতিফলকের ন্যূনতম দূরত্ব কত হবে?

উত্তর : ক্ষণস্থায়ী শব্দ কানে এসে পৌঁছলে, ওই শব্দটি থেমে যাওয়ার পরও ওই শব্দের অনুভূতি আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে আরও 1/10 সেকেণ্ড পর্যন্ত থেকে যায়। বায়ুতে শব্দের বেগ 332 মিটার/সেকেণ্ড হলে এই 1/10 সেকেণ্ডে শব্দ 33.2 মিটার পথ অতিক্রম করে। উৎস থেকে উৎপন্ন শব্দটি প্রতিফলকে প্রতিফলিত হয়ে শ্রোতার কানে ফিরে আসে। সুতরাং কোনও ক্ষণস্থায়ী শব্দের প্রতিধ্বনি স্পষ্ট করে শুনতে হলে, প্রতিফলক এবং উৎসের দূরত্ব কমপক্ষে 33.2/2 = 16.6 মিটার হতে হবে।

9(a) আলোর বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন কাকে বলে? এর একটি ব্যবহারিক প্রয়োগের উল্লেখ করো।

উত্তর : আলোর বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন : সমান্তরাল আলোক রশ্মিগুচ্ছ কোনও অমসৃণ তলে আপতিত হলে, ওই রশ্মিগুচ্ছের প্রতিটি রশ্মি, প্রতিফলনের নিয়ম মেনে চললেও, অমসৃণ তল থেকে প্রতিফলিত রশ্মিগুলি সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছরূপে একটি নির্দিষ্ট দিকে না গিয়ে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়। এই রকম প্রতিফলনকে বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন বলে।

আলোর বিক্ষিপ্ত প্রতিফলনের ব্যবহারিক প্রয়োগ :
(i) বই-এর পৃষ্ঠার ওপর আলোকরশ্মি পড়ে রশ্মিগুলির বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন হয়। এই বিক্ষিপ্ত রশ্মিগুলি আমাদের চোখে এসে পড়ে বলেই আমরা বইয়ের লেখাগুলি পড়তে পারি।
(ii) সিনেমার পরদাটি সাদা এবং খসখসে হয়। ওই পরদায় আলোর বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন হয় বলেই পরদায় উৎপন্ন ছবি হলের প্রতিটি দর্শক দেখতে পায়।

(b) সাধারণ প্রতিফলন এবং অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের মধ্যে পার্থক্যগুলি লেখো।

উত্তর : সাধারণ প্রতিফলন ও অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের মধ্যে পার্থক্য : পাঠ্য বই দ্যাখো।

(c) উত্তল লেন্সের ফোকাস ও ফোকাস দূরত্বের সংজ্ঞা লেখো।

উত্তর : প্রধান অক্ষের সমান্তরাল আলোকরশ্মিগুচ্ছ উত্তল লেন্সের মধ্য দিয়ে প্রতিসৃত হওয়ার পর রশ্মিগুলি প্রধান অক্ষের ওপর অবস্থিত একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর মধ্য দিয়ে যায়। প্রধান অক্ষের ওপর অবস্থিত এই নির্দিষ্ট বিন্দুটিকে ওই উত্তল লেন্সের ফোকাস বলে।

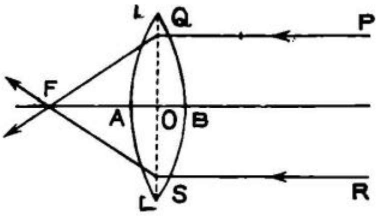

যেমন চিত্রে PQ এবং RS আলোকরশ্মি LL উত্তল লেন্সের প্রধান অক্ষ AB-এর সমান্তরাল ভাবে এসে উত্তল লেন্সের মধ্য দিয়ে প্রতিসৃত হওয়ার পর প্রধান অক্ষের ওপর অবস্থিত F বিন্দুর মধ্য দিয়ে যায়। F বিন্দুটি হল ওই উত্তল লেন্সের প্রধান ফোকাস।
ফোকাস দূরত্ব : উত্তল লেন্সের আলোক কেন্দ্র থেকে প্রধান ফোকাসের দূরত্বকে ওই লেন্সের ফোকাস দূরত্ব বলে। চিত্রে OF দূরত্ব হল লেন্সটির ফোকাস দৈর্ঘ্য।

10(a) ফ্লেমিং-এর বাম হস্ত নিয়ম বিবৃত করো এবং বার্লোচক্রের কার্যনীতি ব্যাখ্যা করো।

(b) অ্যাম্পিয়ারের সন্তরণ সূত্র লেখো। তড়িৎ প্রবাহমাত্রার ব্যবহারিক একক উল্লেখ করো।

উত্তর : বই থেকে দেখে নিও। তড়িৎ প্রবাহমাত্রার ব্যবহারিক একক হল— অ্যাম্পিয়ার।

(b) একস্ রশ্মি এবং ক্যাথোড রশ্মির পার্থক্য কী কী?

উত্তর : বই থেকে দেখে নিও, তবে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যগুলি উল্লেখ করতে হবে।

'গ' বিভাগ

এই বিভাগ থেকে কমপক্ষে তিনটি এবং সর্বাধিক পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়।

11(a) মেন্ডেলিফের পর্যায় সূত্রটি বিবৃত করো। এই সূত্রের আধুনিক ভাষ্যরূপটি কী?

উত্তর : মেন্ডেলিফের পর্যায় সূত্র : বিভিন্ন মৌলের ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্মগুলি, ওদের পারমাণবিক গুরুত্ব বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে পর্যায়ক্রমে পুনরাবৃত্ত হয়।
পর্যায়সূত্রের অধুনিক ভাষ্যরূপ : বিভিন্ন মৌলের ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্মগুলি ওদের পারমাণবিক সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে পর্যায়ক্রমে পুনরাবৃত্ত হয়।

(b) নোবল গ্যাস এবং হ্যালোজেনগুলি পর্যায় সারণীতে কোন শ্রেণীতে অবস্থান করে?

উত্তর : নোবল গ্যাস অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলি পর্যায় শূন্য শ্রেণীতে এবং হ্যালোজেন মৌলগুলি VII B শ্রেণীতে অবস্থান করে।

(c) একটু উদাহরণ দাও যেক্ষেত্রে ভৌত এবং রাসায়নিক পরিবর্তন একই সঙ্গে ঘটে। তোমার উত্তরটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দাও।

উত্তর : একটি মোমবাতি জ্বলার সময় মোমের মধ্যস্থ কার্বন এবং

হাইড্রোজেন বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়— এটি হল মোমের রাসায়নিক পরিবর্তন। এই পরিবর্তনে যে তাপ উৎপন্ন হয় তা দ্বারা কিছু পরিমাণ কঠিন মোম গলে তরলে পরিণত হয়— এটি হল মোমের ভৌত পরিবর্তন।

(d) নিম্নের বিক্রিয়াটিতে ব্যাখ্যা সহ জারক ও বিজারককে শনাক্ত করো

$Cl_2 + 2HI = 2HCl + I_2$

উত্তর : এই বিক্রিয়ায় ক্লোরিনের সঙ্গে হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে HCl উৎপন্ন করে, সুতরাং ক্লোরিনের বিজারণ ঘটেছে। অপর দিকে হাইড্রোআয়োডিক অ্যাসিড HI থেকে হাইড্রোজেন অপসারিত হওয়ার ফলে HI জারিত হয়ে I_2তে পরিণত হয়েছে। সুতরাং এখানে Cl_2 হল জারক এবং HI হল বিজারক।

12(a) পরমাণুর গঠন সম্পর্কিত আধুনিক মতবাদের আলোকে ডালটনের পরমাণুবাদের দুটি ত্রুটির উল্লেখ করো।

ইঙ্গিত : I) ডালটনের পরমাণুবাদে মৌলিক পদার্থের অন্তিম কণা হল পরমাণু। এখন জানা গেছে পরমাণু ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন এবং আরও কয়েকটি আদি কণা দ্বারা গঠিত।

(II) একই মৌলের পরমাণুগুলির ভর এবং ধর্ম অভিন্ন — ডালটনের এই সিদ্ধান্তটি সঠিক নয়। আইসোটোপ আবিষ্কারের পর জানা গেছে একই মৌলের বিভিন্ন ভর এবং ভৌতধর্ম বিশিষ্ট পরমাণু থাকতে পারে (আইসোটোপ)।

(b) 9 গ্রাম জলে অণুর সংখ্যা নির্ণয় করো।

উত্তর : জলের আণবিক সঙ্কেত H_2O, সুতরাং আণবিক গুরুত্ব $= 2 \times 1 + 16 = 18$

সুতরাং 18 গ্রাম জল = এক গ্রাম অণু জল।

$\therefore$ 18 গ্রাম জলে অণুর সংখ্যা $= 6.023 \times 10^{23}$

9 গ্রাম জলে অণুর সংখ্যা $= (6.023 \times 10^{23} \times 9)/18 = 3.0115 \times 10^{23}$

(c) সমযোজ্যতা বলতে কী বোঝো? নীচের যৌগগুলির মধ্যে কোনটি তড়িৎযোজী এবং কোনটি সমযোজী? তোমার উত্তরের ব্যাখ্যা দাও। (i) ক্যালসিয়াম অক্সাইড, (ii) নাইট্রোজেন অণু, (iii) ক্লোরোফর্ম, (iv) পটাশিয়াম ব্রোমাইড।

উত্তর : (1) Ca পরমাণু তার সর্ববহিস্থ কক্ষের 2টি ইলেকট্রন ত্যাগ করে এবং O পরমাণু ওই দুটি ইলেকট্রন তার সর্ববহিস্থ কক্ষে গ্রহণ করে উভয় পরমাণুই তাদের নিকটতম নিষ্ক্রিয় গ্যাসের পরমাণুর কাঠামো লাভ করে এবংতড়িৎ আকর্ষণ দ্বারা পরস্পর যুক্ত হয়ে CaO উৎপন্ন করে। তাই এই যৌগটি হল তড়িৎযোজী যৌগ।

(ii) **N_2 অণু**— দুটি N পরমাণুর প্রত্যেকটি থেকে 3টি করে ইলেকট্রন এসে তিনটি ইলেকট্রন জোড় উৎপন্ন করে। এই তিনটি ইলেকট্রন জোড়কে উভয় পরমাণু সমভাবে ব্যবহার করে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের কাঠামো পায়। তাই নাইট্রোজেন অণু হল সমযোজী।

(iii) **ক্লোরোফর্ম** — একটি C পরমাণু তিনটি Cl পরমাণু এবং একটি H পরমাণুর প্রত্যেকের সঙ্গে একটি করে ইলেকট্রন জোড় গঠন করে $CHCl_3$ অণু উৎপন্ন করে। তাই এটি হল সমযোজী যৌগ।

(iv) **পটাশিয়াম ব্রোমাইড** : K পরমাণু তার সবচেয়ে বাইরের কক্ষের একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে এবং Br পরমাণু ওই ইলেকট্রন নিজের সর্ববহিস্থ কক্ষে গ্রহণ করে উভয় পরমাণু নিষ্ক্রিয় গ্যাসের কাঠামো পেয়ে KBr পরমাণু উৎপন্ন করে। তাই KBr হল তড়িৎযোজী যৌগ।

13(a) পরীক্ষাগারে পটাশিয়াম ক্লোরেট থেকে অক্সিজেন প্রস্তুতিতে পটাশি য়াম ক্লোরেটের সঙ্গে ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড মিশিয়ে দেওয়া হয় কেন ব্যাখ্যা করো। এই বিক্রিয়ায় MNO_2-এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হতে পারে এমন একটি যৌগের নাম করো। $KClO_3$ ব্যতীত অপর একটি যৌগের নাম কর যাকে উত্তপ্ত করলে সহজেই অক্সিজেন উৎপন্ন করা যায় এবং এক্ষেত্রে বিক্রিয়ায় শমিত সমীকরণটি লেখো।

$KClO_3$-কে উত্তপ্ত করে পরীক্ষাগারে O_2 গ্যাস উৎপন্ন করা হয়। দেখা গেছে $KClO_3$-কে উত্তপ্ত করলে খুব ধীর গতিতে $KClO_3$ বিশ্লিষ্ট হয়ে O_2 গ্যাস নির্গত হয়। $KClO_3$-এর সঙ্গে সামান্য MnO_2 মিশিয়ে উত্তপ্ত করলে অনেক কম উষ্ণতায় (200°C – 240°C), $KClO_3$ দ্রুতগতিতে বিশ্লিষ্ট হয়ে O_2 মুক্ত করে।

$2KClO_3 + (MnO_2) = 2KCl + 3O_2 + (MnO_2)$

এখানে MnO_2 ধনাত্মক অনুঘটক রূপে বিক্রিয়ায় উপস্থিত থেকে বিক্রিয়াটির বেগ বাড়ায়, নিজের কিন্তু কোনও রাসায়নিক পরিবর্তন হয় না। এই বিক্রিয়াটিতে MnO_2 এর পরিবর্তে ফেরিক অক্সাইড (Fe_2O_3)ব্যবহার করা চলে।

$KClO_3$ ছাড়া, মারকিউরিক অক্সাইডকে (HgO) উত্তপ্ত করে অক্সিজেন পাওয়া যায়। $2HgO = 2Hg + O_2$

(b) বহুরূপতা কী? কার্বনের দুটি রূপভেদের নাম করো।

উত্তর : বইয়ে দেখে নাও। কার্বনের দুটি রূপভেদ হল হীরক এবং গ্রাফাইট।

(c) সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দহনকার্যে বাতাসের অক্সিজেন বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হতে থাকার ফলে বাতাসে গ্যাসটির পরিমাণ ক্রমশ কমে আসছে। বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ যথাযথ রাখতে সম্ভাব্য একটি উপায়ের সুপারিশ করো।

উত্তর : বিভিন্ন দহনকার্যে অক্সিজেন অংশ নেয় বলে বাতাসে O_2-এর পরিমাণ কমে আসছে এবং CO_2-এর পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতি মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ক্ষতিকারক। গাছের পাতার ক্লোরোফিল, জল এবং CO_2, সূর্যের কিরণে পরস্পর বিক্রিয়া করে গাছের খাদ্য কার্বোহাইড্রেট এবং O_2 উৎপন্ন করে।

$$nCO_2 + nH_2O \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{সূর্যালোক}} \underset{\text{কার্বোহাইড্রেট}}{(CH_2O)} + nO_2 \uparrow$$

সুতরাং দেখা গেল সূর্য কিরণের উপস্থিতিতে, গাছ বায়ুর মধ্যস্থ CO_2কে শোষণ করে এবং O_2 মুক্ত করে। তাই বাতাসে O_2-এর পরিমাণ যথাযথ রাখতে হলে, বেশি করে গাছ লাগাতে হবে।

14(a) অ্যালুমিনিয়াম এবং লৌহের একটি করে আকরিকের নাম ও সঙ্কেত লেখো। এই দুই ধাতুর মধ্যে কোন ধাতুর আকরিকে ভারত সমৃদ্ধ?

উত্তর : অ্যালুমিনিয়ামের আকরিক— বক্সাইট (Al_2O_3, $2H_2O$), লৌহের আকরিক— হেমেটাইট (Fe_2O_3), —এই দুই আকরিকে ভারত সমৃদ্ধ।

(b) তড়িৎ বিশ্লেষ্য কী? পারদ কি তড়িৎ বিশ্লেষ্য?

উত্তর : তড়িৎ বিশ্লেষ্যের সংজ্ঞা দেবে।

পারদ তরল হলেও একটি ধাতু। তরল অবস্থায় থাকলেও আয়নে বিয়োজিত হয় না। পারদ তড়িৎ পরিবহন করে ওর মুক্ত ইলেকট্রনের সাহায্যে— আয়নের সাহায্যে নয়। তাছাড়া পারদের মধ্যে তড়িৎ পরিবহন হলে পারদ নতুন ধর্মবিশিষ্ট পদার্থে পরিণত হয় না। তাই পারদ তড়িৎ বিশ্লেষ্য নয়।

(c) মেথিলেটেড স্পিরিট বলতে কী বোঝো? কপার সালফেট এবং অ্যামোনিয়াম সালফেটের একটি করে ব্যবহার উল্লেখ করো। সিক্ত মাটিতে অ্যামোনিয়াম সালফেটের ক্রমাগত প্রয়োগে মাটির কী ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা?

উত্তর : মেথিলেটেড স্পিরিট এর যৌগগুলির ব্যবহার — পাঠ্য বই দ্যাখো।

দ্বিতীয় অংশের উত্তর হল— সিক্ত মাটিতে, অ্যামোনিয়াম সালফেট জল দ্বারা আর্দ্র বিশ্লেষিত হয়ে অ্যাসিড উৎপন্ন করে। তাই এই সার মাটিতে বেশি দিলে মাটিতে অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে যায়, ফলে গাছ নষ্ট হয়ে যায়। তাই এই সার ক্ষারীয় পদার্থ চুনের সঙ্গে যোগ করে ব্যবহার করা উচিত।

(লেখক স্কটিশচার্চ কলেজিয়েট স্কুলের ভৌতবিজ্ঞানের প্রাক্তন শিক্ষক)

অ্যাসটেরিক্স ও নর্ম্যান দল

গল্প : গোসিনি
ছবি : ইউদেরজো

কপিরাইট : দারগো এডিশন

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ব্যাপারটা তো মজার! আশ্চর্যের কথাও বটে। লোকটা পিছলে পড়ল না! কলার খোসাটাও উধাও!
লোকটার পিছু ধাওয়া করতে হবে তো!
ওরে বাবা রে!
?
দুম করে পড়ে গেলুম বলে লোকটাকে ধরতে পারলুম না। ট্রটস্কির দোহাই। কলার খোসাটাই বা ঠিক পায়ের নীচে এল কী করে?
চলো, এখন ভাল-মন্দ কিছু খেতে হবে।
টিনটিন! আর নয়! জিভে জল এসে যাবে!
ওহো! আমাদের ট্রেন! এখন সোজাসুজি স্টেশনে যেতে হবে।
আমাদের খাওয়াটার কী হল?

টিনটিন ★ হার্জে সোভিয়েত দেশে টিনটিন

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

অরণ্যদেব লি ফক

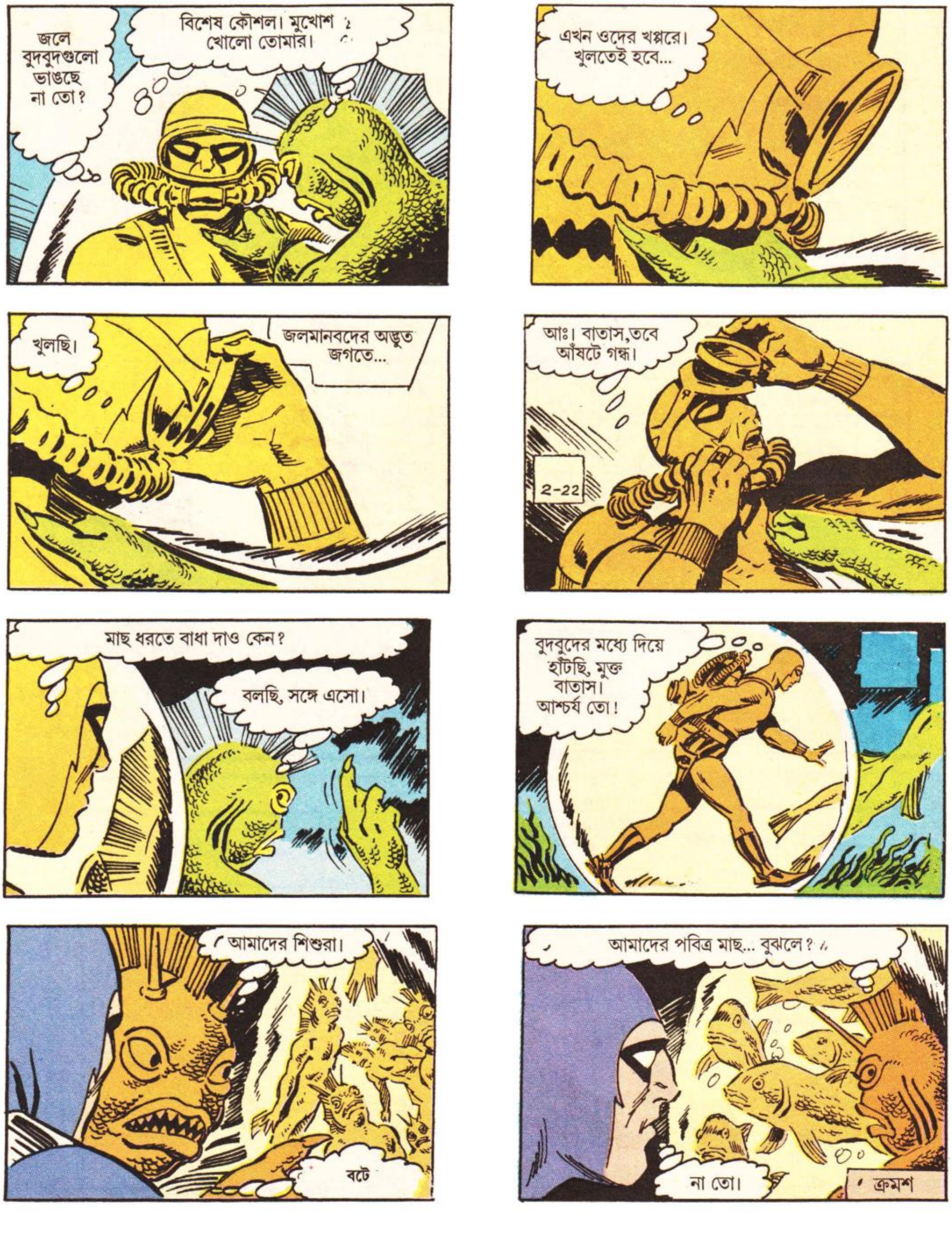

জলে বুদবুদগুলো ভাঙছে না তো?
বিশেষ কৌশল। মুখোশ খোলো তোমার।
এখন ওদের খপ্পরে। খুলতেই হবে...
খুলছি।
জলমানবদের অদ্ভুত জগতে...
আঃ। বাতাস,তবে আঁষটে গন্ধ।
2-22
মাছ ধরতে বাধা দাও কেন?
বলছি, সঙ্গে এসো।
বুদবুদের মধ্যে দিয়ে হাঁটছি, মুক্ত বাতাস। আশ্চর্য তো!
আমাদের শিশুরা।
বটে
আমাদের পবিত্র মাছ... বুঝলে?
না তো।
ক্রমশ

খাদিম-এর হযবরল

ওলটপালট

নীচে আছে চারটি শব্দ। প্রতিটি শব্দের অক্ষরগুলো এলোমেলো ভাবে সাজানো। অক্ষরগুলো ঠিকমতো সাজালেই পাওয়া যাবে সঠিক শব্দটি।

তালরেপাল

ধবণবরা

হিজনকরত

ধারনবণর্জী

নামতা মুখস্থ করতে গিয়ে ছাত্রদের চোখে যা হয়

উত্তর আগামী সংখ্যায়

এবারে পাশের গোলচিহ্নের ভেতরের অক্ষরগুলো উলটেপালটে সাজালেই পাওয়া যাবে ওপরের কার্টুন ছবির সঙ্কেতের সমাধান।

গত সংখ্যার সমাধান

ক্রিকেট খেলায় যখন বহু ওভার বাউন্ডারি হয়

ছ য় লা প

গত সংখ্যার সঠিক শব্দ : অপরিচিত, পিছনপানে, দানখয়রাত, লালিতপালিত।

ঘোষক

গত সংখ্যার সমাধান

সু	র	থ	■	■	বি	ধি	বি	ধা	ন
জ	■	ত	ল	ব	■	■	ব	■	ট
ন	ব	ম	■	স	■	প	র	■	রা
■	ন	ত	■	ন	ক্ষ	ত্র	■	ভু	জ
জ	বা	■	অ	■	মা	পা	জো	খা	■
■	দা	র্শ	নি	ক	■	ঠ	■	মি	ত্র
হা	ড়	■	কে	শ	র	■	মা	ছি	■
ল	■	শ	ত	■	ক্তি	■	লা	ল	ন
খা	■	র	■	■	ম	ঘ	বা	■	ব
তা	জ	ম	হ	ল	■	■	র	জ	নী

১২ এপ্রিল ২০০০ সংখ্যার শব্দসন্ধানের প্রথম তিনজন সঠিক উত্তরদাতা :

বনশ্রী হোড়, হাওড়া-৪; **সুবর্ণা গুপ্ত**, কলকাতা-৩৭; **অদিতি মণ্ডল**, হুগলি-১০।

দেবসেনাপতি

শব্দসন্ধান

১		২	■	■	৩		৪		৫
	■	৬		৭	■	■		■	
৮	৯		■		■	১০		■	
■	১১		■	১২	১৩		■	১৪	
১৫		■	১৬	■	১৭				■
■	১৮			১৯	■		■	২০	
২১		■	২২		২৩	■	২৪		■
	■	২৫		■		■	২৬		২৭
	■		■	■	২৮			■	
২৯					■	■	৩০		

সংকেত : পাশাপাশি :

(১) অতি কোপনস্বভাব মুনি, যিনি রাগলেই অভিশাপ দিতেন। (৩) অবিশ্রান্ত। (৬) দৈত্য। (৮) মুহূর্ত। (১০) হাত। (১১) সাহেবের— চুল, নীল চক্ষু। (১২) যে গোরু চরায়। (১৪) আমাদের প্রিয় ভূমি। (১৫) এর পাত্র হাত থেকে মাটিতে পড়লেই চুরমার। (১৭) রাজসভা। (১৮) নির্লজ্জ, বেহায়া। (২০) এটি কমিয়ে কাজ বেশি করতে হয়। (২১) জংলি। (২২) প্রচার। (২৪) ফিকির, মতলব। (২৫) প্রতিজ্ঞা। (২৬) বড় নৌকোবিশেষ। (২৮) বাঁশ চেঁছে তৈরি-করা চাটাই। (২৯) কাঁটায় ভরা। (৩০) মুসলমান শাসনকর্তা, যাঁরা রাজার হালে দিন কাটাতেন।

উপর-নীচ :

(১) যার দেহের শক্তি কম। (২) সরল, আড়ম্বরশূন্য। (৪) যেখানে জাহাজ এসে থামে। (৫) শিবের— করায় মদনকে ভস্মীভূত হতে হয়। (৭) অংশ, ভাগ। (৯) হতভম্ব হওয়া। (১০) ভোর হতেই পাখির যা শোনা যায়। (১৩) পাহাড়ি পথের বহু গাড়ি এখানে পড়ে যায়। (১৪) বন্দুকধারী রক্ষী। (১৬) অপ্রয়োজনে, অনর্থক। (১৯) পুজায় ব্যবহৃত তামার থালা। (২১) ধড়িবাজ, ভণ্ড। (২৩) ঝগড়া বাধাবার দেবতা। (২৪) দৌড়চ্ছে এমন। (২৫) চোখের পাতা। (২৭) রামচন্দ্র।

দেবসেনাপতি

পুরস্কার

এই শব্দসন্ধানের সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্যে যে তিনজনের উত্তর 'আনন্দমেলা' পত্রিকা দফতরে প্রথম এসে পৌঁছবে, তাদের খাদিমের পক্ষ থেকে দেওয়া হবে পুরস্কার। উত্তর পাঠাতে হবে - ৩ মে তারিখের মধ্যে।

জেরক্স প্রতিলিপি গ্রাহ্য হবে না

Model : 138007/8/9
Size : 2 - 5/12 - 1/9-11
Price : Rs. 185.00/163.00/150.00

Model : 210003/004
Size : 1 - 8/9 - 13
Price : Rs. 93.00/83.00

Model : 269000/1/2/3
Size : 5 - 8/9 - 2/3 - 5/6 - 9
Price : Rs. 55.00/65.00/78.00/85.00

Khadim's®
Schooldays
SMARTNESS... পায়ে পায়ে

কুইজ

গত সংখ্যার উত্তর

১. হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল্স। ২ এপ্রিল প্রদীপ জ্বালিয়ে এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। সূচনায় ছিল একটি গান, যাতে এই স্বপ্ন সফল করার অঙ্গীকার। গানটি হল, "তাম্রলিপ্ত আবার হবে নতুন নামে হলদিয়া"।

২. তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী বুলন্ত এজেভিট। হতে পারতেন কবি, পণ্ডিত, নিদেনপক্ষে মাস্টারমশাই। কিন্তু গণতন্ত্রের প্রতি আগ্রহ কবিতাপ্রেমী এই মানুষটিকে শেষ পর্যন্ত করে তুলেছে তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী।

৩. কেরলের পরিবেশবিদ সাংবাদিক জোসেফ সি জন।

৪. মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন। সম্প্রতি ভারত সফরে এসে অন্ধ্রের 'সাইবারাবাদে' (হায়দরাবাদ) ঘোরার সময় এই ড্রাইভিং লাইসেন্স উপহার দেওয়া হয় তাঁকে।

৫. এটি ভারত-বাংলাদেশ দু' দেশের ২৩ জন তরুণ সেনাকে নিয়ে গঠিত যৌথ র‍্যাফ্‌টিং অভিযান। সিকিমের রাজধানী থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে সিমবুথাঙে অভিযানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন থার্টি থ্রি কোরের চিফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল ভি জয়শঙ্কর। অভিযানের সমাপ্তি বাংলাদেশের গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়িতে।

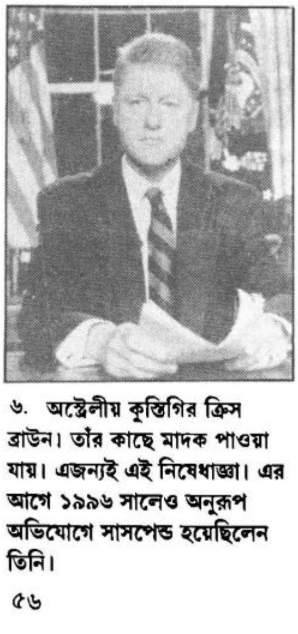

৬. অস্ট্রেলীয় কুস্তিগির ক্রিস ব্রাউন। তাঁর কাছে মাদক পাওয়া যায়। এজন্যই এই নিষেধাজ্ঞা। এর আগে ১৯৯৬ সালেও অনুরূপ অভিযোগে সাসপেন্ড হয়েছিলেন তিনি।

প্রশ্ন

১. স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর ভারতে সেটাই প্রথম রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। সে ঘটনায় সারা দেশ শোকে পাথর হয়ে গিয়েছিল। সেই হত্যাকাণ্ডের এফ আই আর আজ ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এবার প্রযুক্তির দৌলতে সেই প্রাথমিক তথ্যসংবলিত রিপোর্ট সাধারণ মানুষও দেখার ও পড়ার সুযোগ পাবেন। একই ভাবে দেখা যাবে ইন্দিরা গাঁধী হত্যাকাণ্ডের মূল এফ আই আর-এর চেহারাও। কীভাবে?
বিশ্বজিৎ হেমব্রম, উদয়পুর বাথান, পুরুলিয়া।

২. আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সংস্কৃত পণ্ডিত তিনি। অন্তত ৪০টি গ্রন্থের লেখক। সাহিত্য অকাদেমি ও রাষ্ট্রপতির বিশেষ পুরস্কারপ্রাপ্ত। বয়স হয়েছিল ৮২। গত ১৫ এপ্রিল নাগপুরে এক পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটেছে তাঁর। কে এই সদ্য প্রয়াত গুণী পণ্ডিত?
অনীক ভট্টাচার্য, গোসাবা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

৩. সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে দুঁদে এবং সুদক্ষ নেতা হিসেবে পরিচিতি ছিল তাঁর। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর হন বিচ্ছিন্ন এক রাষ্ট্রের প্রধান। প্রেসিডেন্ট পদে পুনর্নির্বাচিত হলেন তিনি। কে এই নেতা?
তথাগত বর্মন, তেজপুর, অসম।

৪. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে ১৪ এপ্রিল একটি শোকের দিন হিসেবে গণ্য হয়। কেন?
তীর্থঙ্কর পাণিগ্রাহী, রঘুনাথগঞ্জ, মেদিনীপুর।

৫. পশ্চিমবঙ্গে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে একই দিনে পালিত হয় নববর্ষ। কিন্তু শুধু বাংলাদেশ নয়, ভারতের প্রতিবেশী আরও একটি রাষ্ট্রেও একই দিনে পালিত হয় এই নববর্ষ উৎসব। কোন রাষ্ট্র?
পল্লব শিকদার, পাল্লা রোড, বর্ধমান।

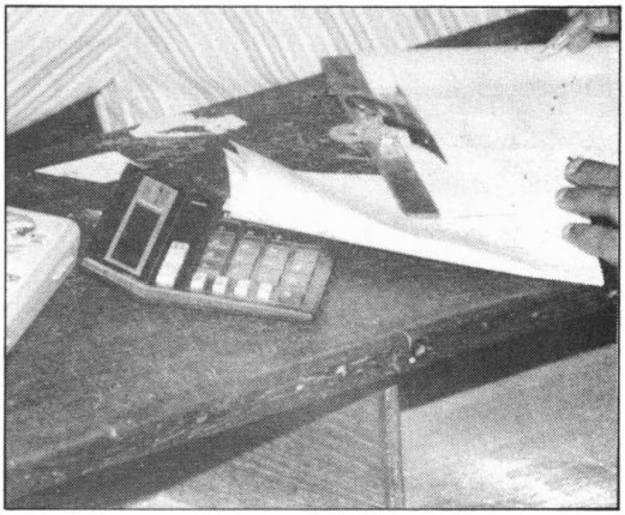

৬. কলম্বোয় অনুষ্ঠিত হবে তৃতীয় এশীয় কবাডি চ্যাম্পিয়ানশিপ। ভারত অংশ নিচ্ছে ওই প্রতিযোগিতায়। ভারতীয় দলের নেতৃত্ব দেবেন কে? এই দলের কোচ ও ম্যানেজার কে?
শান্তনু মজুমদার, মিল্ক কলোনি, কলকাতা।

৭. এই প্রথম অনুষ্ঠিত হতে চলেছে মহিলাদের গোল্ড কাপ টুর্নামেন্ট। অনুষ্ঠিত হবে জুনের ২৩ তারিখ থেকে জুলাইয়ের ৩ তারিখ পর্যন্ত। অংশ নেবে ব্রাজিল, কোস্টা রিকা, ট্রিনিদাদ, টোবাগো, গুয়াতেমালা, চিন, আমেরিকা। কোথায় হবে এই খেলা?
অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়, গল্ফ গ্রিন, কলকাতা।

৮. এতদিন একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল পরীক্ষার হলে এর ব্যবহার। কিন্তু নতুন যুগে প্রযুক্তির সহায়তাকে যাতে কাজে লাগাতে পারে ছাত্রছাত্রীরা, সেজন্য অতি সম্প্রতি তুলে নেওয়া হল নিষেধের এই বেড়াজাল। কী জিনিস? কোথায় ব্যবহারের সুযোগ মিলল?
কৌশিক সামন্ত, বাঁশদ্রোণী, কলকাতা।

৯. বিশ্বের সবচেয়ে উঁচুতে অবস্থিত এস টি ডি বুথ কোথায় অবস্থিত?
সায়ন্তনী চক্রবর্তী, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

১০. ভারতে সবচেয়ে কমবয়সী এম সি পি (মাইক্রোসফ্‌ট সার্টিফায়েড প্রোফেশনাল) এখন কে?
সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, চেমাগুড়ি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

১১. মন্দিরের স্তম্ভে মৃদু আঘাত করলেই বেজে ওঠে জলতরঙ্গের মতো সুরেলা বাজনা। এই ভারতেই। কোথায়?
সন্দীপন রায়, বিজয়গড়, কলকাতা।

১২. ইউরোপের তিনটি দেশ। রানির শাসনাধীন। কোন-কোন দেশ?
আর্য সেনগুপ্ত, যোধপুর পার্ক, কলকাতা।

১৩. বিশ্ব সঙ্গীত দিবস হিসেবে পালন করা হয় বছরের কোন দিনটি?
জয়িতা বসু, কসবা, কলকাতা।

১৪. লেবুর গন্ধযুক্ত চা। তাকে সাধারণত কী বলা হয়?
ঈশিতা মহলানবীশ, মধ্যমগ্রাম, উত্তর ২৪ পরগনা।

(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

কুইজ

এবারের বিষয় : খেলাধুলো

প্রশ্ন

১. সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন সারা বিশ্বের অন্যতম সেরা ফুটবলারের সম্মান পাওয়া এই খেলোয়াড়। তাঁর জন্ম ১৯১৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারি। শারীরিক দক্ষতা এতটাই ছিল যে, ৫০ বছর বয়স অবধি ফুটবল খেলেছেন তিনি। এফ এ কাপ জেতেন ৩৮ বছর বয়সে। ১৭ বছর বয়সে পেশাদার হন। ইংল্যান্ডের হয়ে শেষ যেবার খেলেন তখন তাঁর বয়স ৪২। একবার নয়, দু'-দু'বার বর্ষসেরা ইউরোপীয়

ফুটবলারের সম্মান অর্জন করেছিলেন তিনি। ইংল্যান্ডের হয়ে খেলেছেন ৫৪ বার। ইংল্যান্ডের ফুটবল লিগে খেলেছেন মোট ৭১০টি ম্যাচ। কে এই প্রবাদপ্রতিম ফুটবলার?

২. ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৭—টানা পাঁচ বছর টাটার হয়ে ফুটবলে মাঠ মাতিয়েছে বাংলার এই কিশোর ফুটবলার। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে ডিসিএম, ডুরান্ড, আইএফএ শিল্ড, নাগজি ও রোভার্স কাপে দুর্দান্ত তার পারফরম্যান্স। ডিসিএমে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলে সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয় সে। অনূর্ধ্ব ষোলো এবং অনূর্ধ্ব উনিশে ভারতীয় দলের হয়ে খেলে সকলের প্রশংসা আদায় করে। বেঙ্গল মুম্বই ক্লাবে তার খেলা

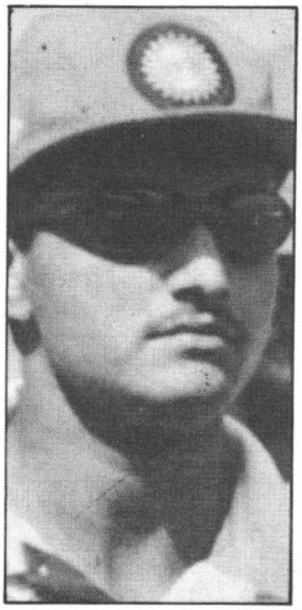

দেখে ইস্টবেঙ্গলের কর্মকর্তারা তাকে নিয়ে আসেন ক্লাবে। বর্তমানে বাংলার ফুটবলে শিশির ঘোষ ও দীপেন্দু বিশ্বাসের পর এত ভাল স্ট্রাইকার বহুদিন দেখা যায়নি বলেই মনে করছেন ফুটবল-বোদ্ধারা। তার প্রিয় খেলোয়াড় আই এম বিজয়ন। কে এই বাংলার তরুণ ফুটবলপ্রতিভা? তাঁর প্রথম কোচ কে?

৩. সহোদর ভাই, দু'জনেই ভারতের হয়ে টেস্ট খেলেছেন একসঙ্গে, এমন ঘটনা বেশ কয়েকবারই ঘটেছে। এমন কতজন সহোদর ভাই একসঙ্গে খেলেছেন? কবে? কী এঁদের পরিচয়?

৪. অভিজ্ঞতাটা মোটেই সুখকর নয়। টেস্টে আম্পায়ারিং জীবনের সূচনায় প্রথম টেস্টের প্রথম বলেই ব্যাটস্ম্যানকে আউট ঘোষণা করা। বিশ্বে এমন ঘটনা ঘটেছে দু'জন আম্পায়ারের ক্ষেত্রে। কে এঁরা? ঘটনা ঘটেছিল কত সালে? আউটই বা কে-কে হয়েছিলেন?

৫. "নেতৃত্ব ছেড়ে আমার নিজেকে এখন মুক্ত পুরুষ মনে হচ্ছে। আমি এখন স্বচ্ছন্দে খেলব।" এমন কথা সম্প্রতি বলেছেন কোন খেলোয়াড়?

৬. একের পর এক নতুন রেকর্ড গড়ছেন ক্রিকেটার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। কিন্তু জামশেদপুরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খেলাটিতে এক অন্যরকমের নজির গড়লেন তিনি। কী সেই নজির?

৭. একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচে একসঙ্গে দুই ওপেনিং ব্যাটস্ম্যানের সেঞ্চুরি করার নজির আছে ক'টি? যে জুটি এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তাঁরা কে-কে?

৮. সুনীল গাওস্করের ১০ হাজার রানের গণ্ডি পেরিয়ে তাঁর ওই রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার অ্যালান বর্ডার। মার্চের ২৮ তারিখে ভেঙে গেল আর-এক ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটের রেকর্ড। কী সেই রেকর্ড? কে ভাঙলেন?

উত্তর

১. সার স্ট্যান্‌লি ম্যাথুজ। ২. চুঁচুড়া শহরের ছেলে হুগলি মহসিন কলেজের ছাত্র শেখ সঞ্জীব। তার প্রথম কোচ অনিত চট্টোপাধ্যায়। ৩. ১০ জন বা পাঁচ জোড়া। প্রথম- সি কে এবং সি এস নাইডু (১৯৩৩-৩৪) ও ১৯৩৬)। দ্বিতীয়- ওয়াজির আলি ও নাজির আলি (১৯৩২ এবং ১৯৩৩-৩৪)। তৃতীয়- এল রামজি এবং এল অমরসিংহ (১৯৩৩-৩৪)। চতুর্থ- কৃপাল সিংহ ও মিলখা সিংহ (১৯৬১-৬২)। পঞ্চম- সুরিন্দর অমরনাথ ও মহিন্দর অমরনাথ (১৯৭৬)। ৪. ইংল্যান্ডের বিল অ্যালে এবং ভারতের হরপ্রসাদ শর্মা। ১৯৭৪ সালে বিল প্রথম বলেই আউট ঘোষণা করেন সুনীল গাওস্করকে। আর হরপ্রসাদ ১৯৭৪-৭৫ সালে কলকাতা টেস্টে প্রথম বলেই আঙুল তুলে আউট দেন সুধীর নায়েককে। ৫. ভারতীয় ক্রিকেটে অধিনায়কের ভূমিকায় চূড়ান্ত ব্যর্থতার পর শচীন তেন্ডুলকর। নেতৃত্ব ছাড়ার পর কোচিতে গিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন। ৬. জামশেদপুরের এই ম্যাচে ভারতের হয়ে প্রথম রানটি করেন তিনি। আবার জয়ের মার অর্থাৎ খেলার শেষ রানটিও এসেছে তাঁরই ব্যাট থেকে। ৭. এমন ঘটনা ঘটেছে সাতবার। প্রথমবার : জিওফ মার্শ (১০৪) ও ডেভিড বুন (১১১)। ১৯৮৬ সালে ৭ সেপ্টেম্বর জয়পুরে, ভারতের বিরুদ্ধে। দ্বিতায় : রামিজ রাজা (১০৭) ও সঈদ আনোয়ার (১২৬)। ১৯৯০ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি এডিলেডে, শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে। তৃতীয় : সঈদ আনোয়ার (১১০) ও রামিজ রাজা (১০৯)। ১৯৯৩ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি শারজায়, শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে। চতুর্থ : সঈদ আনোয়ার (১০৭) ও আসিফ মুজতবা (১১৩)। ১৯৯৩ সালের ৩০ অক্টোবর, শারজায়, শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে। পঞ্চম : দীপক চৌদাসামা (১১২) ও কেনেডি ওটিনো (১৪৪)। ১৯৯৭-এর ১০ অক্টোবর, নাইরোবিতে, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। ষষ্ঠ : সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় (১০৯) ও সচিন তেন্ডুলকর (১২৮)। ১৯৯৮ সালের ৭ জুলাই কলম্বোয়, শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে। সপ্তম : গ্যারি কার্স্টেন (১১৫) ও এইচ গিবস (১১১)। ২০০০ সালের ৯ মার্চ, কোচিতে, ভারতের বিরুদ্ধে। ৮. কপিলদেব নিখাঞ্জের ৪৩৪টি উইকেট পাওয়ার বিশ্ব রেকর্ড। এটি ভাঙলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের কোর্টনি ওয়ালশ। জিম্বাবোয়ের হেনরি ওলোঙ্গার উইকেট নিয়ে তিনি টপকে গেলেন কপিলের রেকর্ড। এখন ওয়াল্‌শের লক্ষ্য ৫০০ উইকেট নেওয়া।

আর্চি
জাগহেড, দ্যাখো লোকটাকে। তুমি পারবে ওর মতো খাটতে?
আমি পরিশ্রম করি...
খররররর
কাজ চলছে
যাতে বেশি খাটতে না হয়।
খ-র-র-র
জাগহেড, বাগানে আগাছা সাফ করতে এসো।
ধুত্তেরি।
মাথা খাটাতে হবে। দেখি এই মোজাটা কাজে লাগাই।
জাগহেড, হাতে ফেট্টি বাঁধা কেন?
চিঠির জবাব দিতে দিতে হাত ব্যথা। ওই মোয়ার তো ঠেলতে পারব না।
এক হাতে স্টিয়ারিং ধরতে পারবে?
এমন প্রশ্ন কেন?
ওই লন মোয়ারটা দ্যাখো। স্টিয়ারিং ধরলেই চলে।

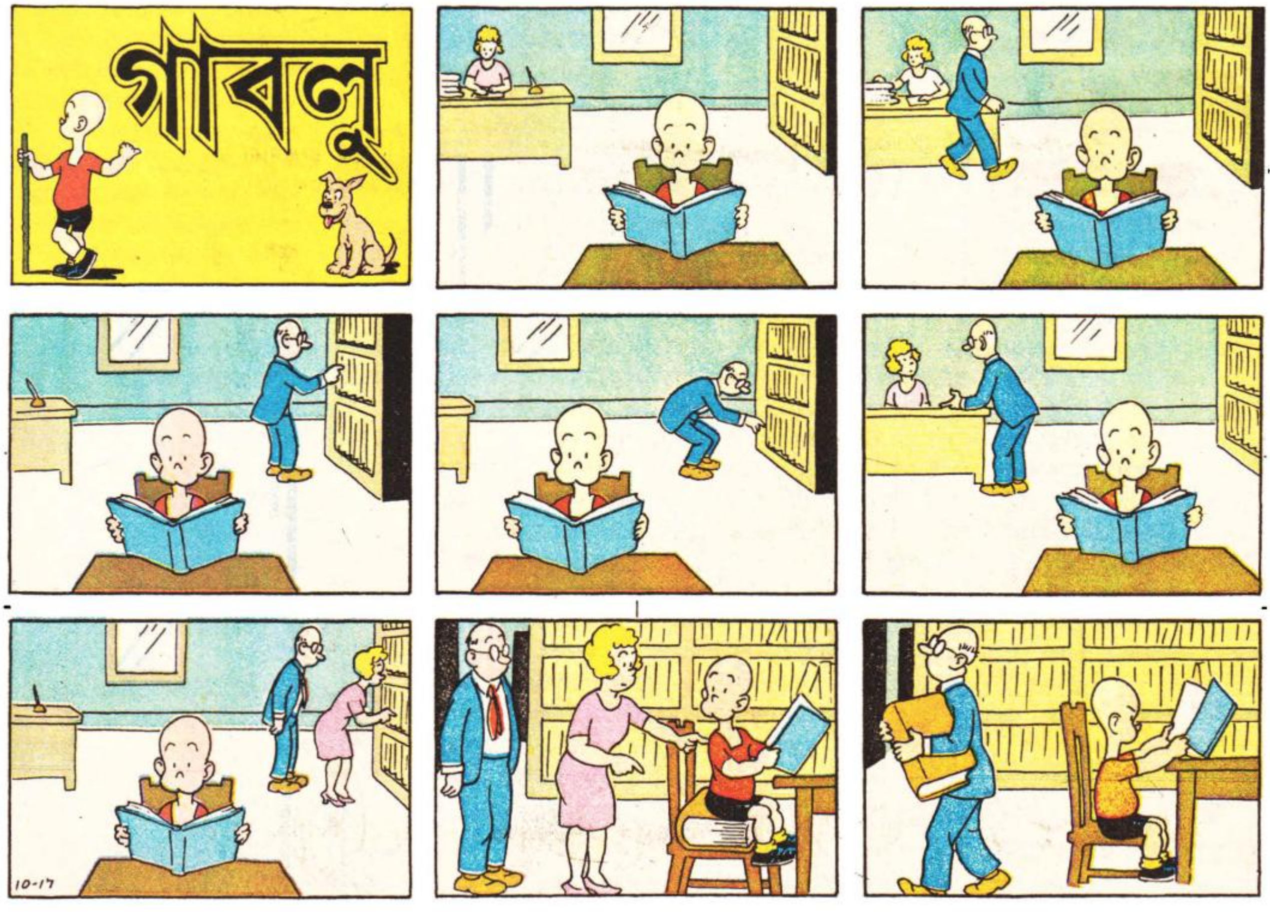
গাবলু
10-17

হাতির দাঁতের ব্যবসা

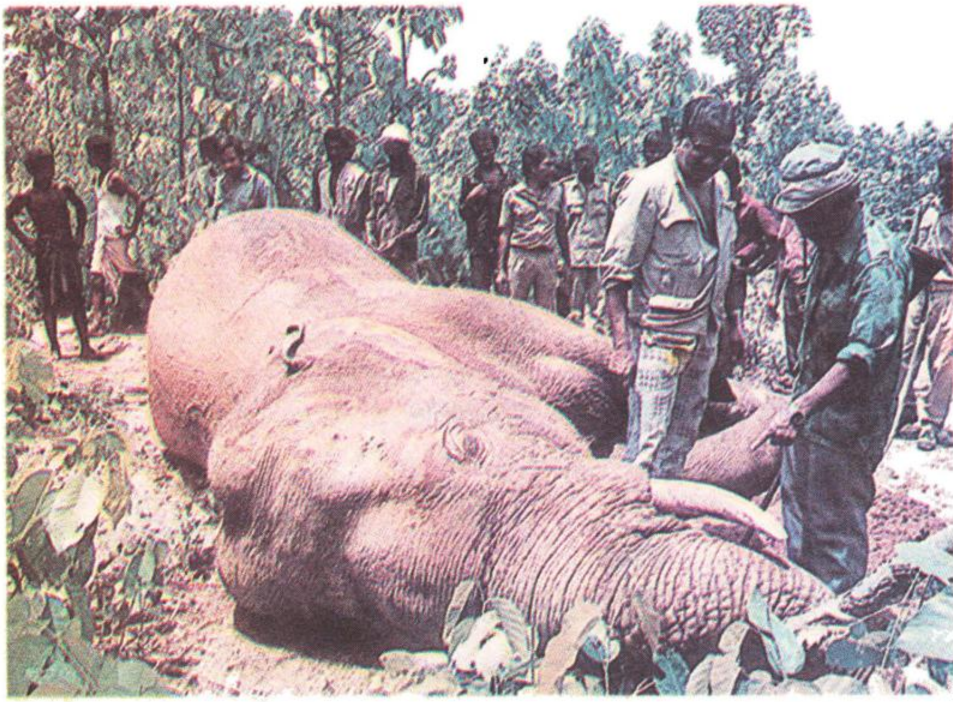

হাতি, বা বলা ভাল, হাতির দাঁত আবার খবরে। সম্প্রতি শোনা গেছে যে বন্যপ্রাণী বেচা-কেনা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থা CITES হাতির দাঁতের ব্যবসাকে আবার আইনসিদ্ধ করতে পারে। এ-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এ-মাসের শেষে নাইরোবির বৈঠকে। প্রসঙ্গত, ১৫১টি দেশ CITES-এর সদস্য। এক দশক বন্ধ রাখার পর হাতির দাঁতের ব্যবসাকে আইনসিদ্ধ করার বিরুদ্ধে যে দেশগুলি প্রতিবাদ জানিয়েছে, তার অন্যতম ভারত। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, এশিয়ার হাতির সংখ্যা এখন ৫০ হাজারেরও কম এবং নতুন আইন চালু হলে এদের অস্তিত্ব নিয়ে টানাটানি পড়বে।

পৃথিবীর উষ্ণতা

পৃথিবীর উষ্ণতা নিয়ে বিতর্ক থামছে না। সম্প্রতি পৃথিবীর শক্তিমান আটটি দেশ, জি এইটের পরিবেশমন্ত্রীরা জাপানের ওতসু শহরে বসেছিলেন। তিন বছর আগের গ্লোবাল ওয়ার্মিং 'কিয়োতো প্রোটোকল' কতদিনে কার্যকর হবে, তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে। বেশিরভাগ দেশের কাছেই ২০০২ সাল কিয়োতে প্রোটোকল চালু করার পক্ষে উপযোগী সময় মনে হলেও আমেরিকার প্রতিনিধি এই নিয়ে কোনও মতামত জানাননি। এ-প্রসঙ্গে বলা যায়, ইউনাইটেড নেশনস-এর এক সমীক্ষক দল জানিয়েছেন যে, অবিলম্বে বেশ কিছু ব্যবস্থা না নিলে আগামী শতকে পৃথিবীর গড় তাপমান ২° সেলসিয়াস থেকে ৬° সেলসিয়াস বাড়বে।

জিন-মানচিত্র

মানুষের পূর্ণাঙ্গ জিন ম্যাপ তৈরির প্রথম ধাপ শেষ। অন্তত এরকমই দাবি করেছেন আমেরিকান কোম্পানি সেলেরা জেনোমিক্স। কোম্পানির চেয়ারম্যান মিঃ ক্রেগ ভেন্টারের মতে, 'এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার।' প্রসঙ্গত হিউম্যান জেনোম প্রোজেক্ট বা মানুষের জিন ম্যাপ তৈরির কাজ একই সঙ্গে চলছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে।

আমেরিকায় ও ফ্রান্সে প্রোজেক্টের মূল কাজ হলেও আমাদের দেশেও এর একটা অংশের কাজ হয়েছে। বিজ্ঞানীদের মতে, পূর্ণাঙ্গ জিন ম্যাপ তৈরি হয়ে গেলে শুধুমাত্র জিনগত রোগ সারানোই যে অনেক সহজ হবে তাই নয়, হয়তো পালটে যাবে মানুষের ভবিষ্যৎও।

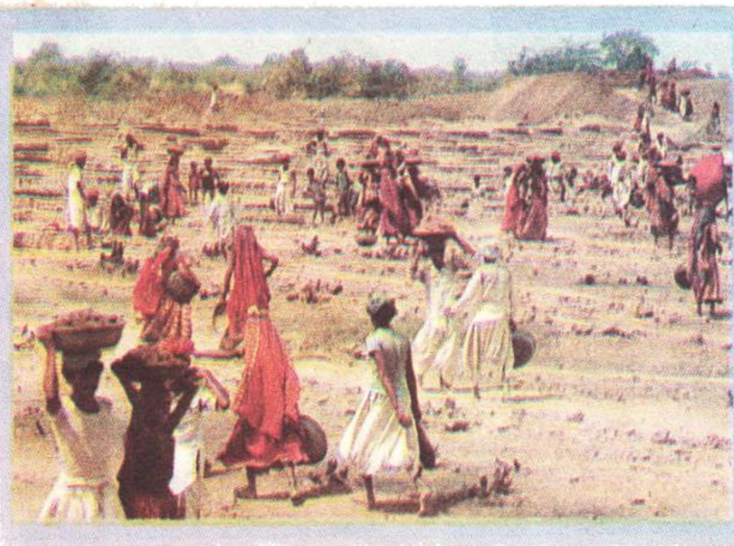

জল নিয়ে নিঃশব্দে বিপ্লব

বীরভূম, মেদিনীপুরের গ্রামের মহিলারা নিঃশব্দে এক বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছেন। এই দুই জেলার যে অঞ্চলগুলি গ্রীষ্মকালে প্রায় জলশূন্য হয়ে পড়ে, সেখানে এক ইন্দো-জার্মান প্রোজেক্টের মূল দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন এলাকার মহিলারা। তাঁরা যে শুধুমাত্র প্রোজেক্টের খুঁটিনাটি কাজগুলিই করেছেন তাই নয়, ভেঙে পড়ে থাকা টিউবওয়েলও সারাচ্ছেন তাঁরা। পশ্চিমবঙ্গের 'পাবলিক হেলথ এঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট'-এর সঙ্গে একযোগে হওয়া প্রকল্পটির আরও অভিনবত্ব এই যে, এটা চালানোর কিছু খরচ গ্রামবাসীরা নিজেরাই দিচ্ছেন।

জয়ন্ত বসু

৫০০ উইকেটের আগে থামবেন

টেস্টে সবচেয়ে বেশি উইকেট পেয়েছেন যেমন, তেমনই তাঁর সংগ্রহে সবচেয়ে বেশি শূন্য করার রেকর্ডও। এসব ছাপিয়ে উঠেছে ওয়াল্‌শের খেলোয়াড়ি মনোভাব। লিখেছেন তানাজি সেনগুপ্ত

ঐতিহাসিক মাঠ সাবিনা পার্ক। ওয়েস্ট ইন্ডিজের জামাইকার এই মাঠেই গ্যারি সোবার্স টেস্টে ব্যক্তিগত সবচেয়ে বেশি রানের অসাধারণ ইনিংসটি খেলেছিলেন। বিপক্ষে ছিল পাকিস্তান, সময়টা ১৯৫৮। সোবার্সের রান ছিল অপরাজিত ৩৬৫। আর এই মাঠেই সদ্য (২৭ মার্চ,২০০০) জিম্বাবোয়ের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের অন্য এক মহাতারকা কোর্টনি ওয়াল্‌শ টেস্টে সবচেয়ে বেশি উইকেট নেওয়ার বিশ্বরেকর্ড গড়লেন। আউট করলেন হেনরি ওলোঙ্গাকে, পেলেন ৪৩৫টি উইকেট। জামাইকার ছেলে ওয়াল্‌শের ঘরের মাঠ সাবিনা পার্ক। সেখানে এই ঐতিহাসিক রেকর্ড করতে পেরে উচ্ছ্বসিত ওয়াল্‌শ। সাবিনা পার্কের প্রতিটি ঘাস তাঁর চেনা, পিচ তাঁর বন্ধু। তাই সেই পিচ সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া, "রেকর্ড করার পক্ষে এর চেয়ে ভাল জায়গা হয় না।"

বিশ্বরেকর্ড গড়লেও এখানেই কিন্তু থামতে চান না ৩৭ বছরের পরিশ্রমী, লড়াকু ফাস্ট বোলারটি। দক্ষিণ আফ্রিকার পেস বোলার অ্যালান ডোনাল্ড জানিয়েছেন, "ওয়াল্‌শি হয়তো ৫০০ উইকেটে গিয়ে থামবে।" 'হয়তো' কারণ ওয়াল্‌শের মতো বোলার সহজে থামতে জানেন না। ফলে কোথায় গিয়ে তিনি থামবেন তা অনুমান করা যায় না।

টেস্টে ৫০০ উইকেট পাওয়া তো স্বপ্ন, ১০০ উইকেট পাওয়াই সহজ কথা নয়। সেটা অবশ্য অনেকে পেয়েছেন, ২০০ উইকেট পেয়েছেন অল্প কয়েকজন, ৩০০ উইকেট পাওয়া বোলারের সংখ্যা আরও কম। ৪০০ উইকেট পেয়েছেন তিনজন : রিচার্ড হ্যাড্‌লি (৪৩১), কপিলদেব (৪৩৪) এবং ওয়াল্‌শ (৪৩৫)। কপিলদেব দীর্ঘদিন ছিলেন এক নম্বরে, ওয়াল্‌শ এখন সবার আগে। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে কপিলের চেয়ে ওয়াল্‌শের কৃতিত্ব বেশি। কারণ, তিনি ভারত-সেরা বোলার কপিলের চেয়ে ১৭টি টেস্ট কম খেলেই এই রেকর্ড গড়েছেন। তবে শুধু ক্রিকেট-মাঠের রেকর্ড নয়, ক্রিকেটীয় আচরণেও ওয়াল্‌শ অনেকের চেয়ে এগিয়ে। তাঁকে বলা হয়েছে, 'গ্রেট অ্যাম্বাসাডর অব দ্য গেম'। এখানেও তিনি একক, অনন্য।

ক্রিকেট-মাঠেই প্রকৃতপক্ষে জন্ম ওয়াল্‌শের। বল-ব্যাটের শব্দ শুনতে শুনতে তাঁর বড় হয়ে

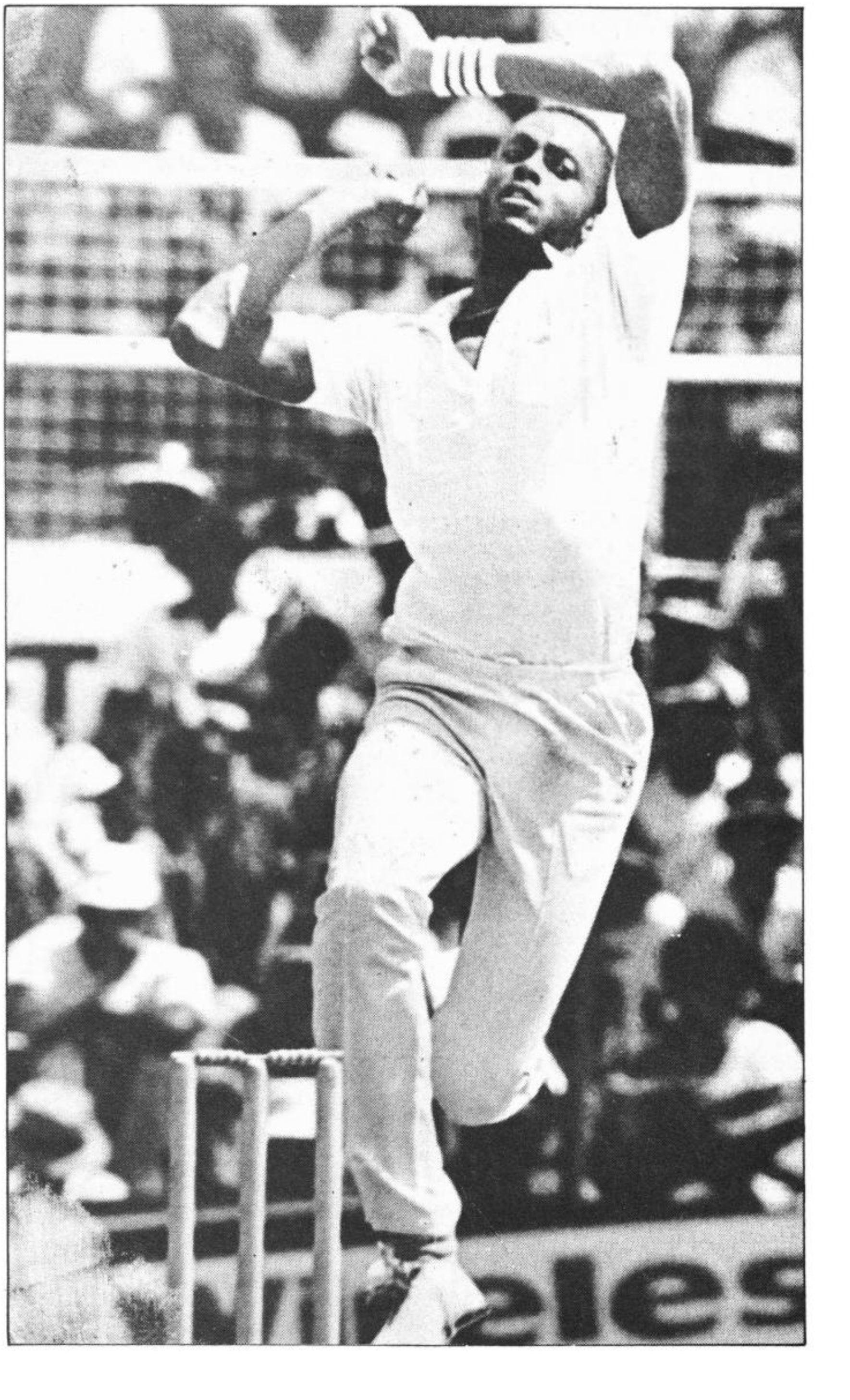

না কোর্টনি ওয়াল্‌শ

ওঠা। মেলবোর্ন ক্রিকেট ক্লাবের উলটো দিকে যেখানে বাউন্ডারি দেওয়াল, তার গায়েই তাঁর বাড়ি। এক্সেলসিস স্কুলের ছাত্র হিসেবে এই মাঠেই ফাস্ট বোলিংয়ের পাঠ নেওয়া শুরু করেছিলেন ওয়াল্‌শ। মেলবোর্ন ক্রিকেট ক্লাবের হয়েও দীর্ঘদিন খেলেছেন তিনি। পেসারদের স্বর্গ সাবিনা পার্কের মাঠ থেকে উঠে এসেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের আর-এক কিংবদন্তি ফাস্ট বোলার মাইকেল হোল্ডিং। তাঁকে আদর্শ করেই এগিয়েছেন ওয়াল্‌শ। হোল্ডিংয়ের মতোই ওয়াল্‌শ একে-একে দক্ষতার ধাপ অতিক্রম করেছেন। প্রথমে খেলেছেন মেলবোর্ন ক্রিকেট ক্লাবে, তারপর জামাইকা ইয়ুথ টিমে, তারপর জামাইকার হয়ে এবং অবশেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে।

কোর্টনি অ্যান্ড্রু ওয়াল্‌শ (জন্ম ৩০ অক্টোবর, ১৯৬২) প্রথম টেস্ট খেলেন অস্ট্রেলিয়ার পার্থে, ১৯৮৪-'৮৫ মরসুমে। তারপর দীর্ঘ ১৬ বছর দেশের হয়ে খেলছেন। উত্থান-পতন, সুখ-দুঃখের মধ্যে দিয়ে কেটেছে এই সময়। দেশকে একক কৃতিত্বে জিতিয়েছেন বহুবার টেস্টে হ্যাট্‌ট্রিক করেছেন, ওয়ান ডে ম্যাচে ১ রানে পাঁচ উইকেটও নিয়েছেন। আবার টেস্টে সর্বাধিক শূন্য করার (৩৫ বার) 'বিশ্বরেকর্ড'ও করেছেন। দল থেকে বাদও পড়েছেন। ভেঙে পড়েননি কিন্তু ওয়াল্‌শ। দৃঢ় মানসিকতা, প্রতিজ্ঞা, লড়াই, পরিশ্রমের জোরে আবার শিরোনামে ফিরে এসেছেন। শুধু প্রতিভা নয়, দক্ষতার শীর্ষে থাকার জন্য ওয়াল্‌শ সবসময় জোর দিয়েছেন পরিশ্রমের ওপরে। ভারতের ওপেনিং ব্যাটস্‌ম্যান নভজ্যো ত সিংহ সিধু শুনিয়েছেন ওয়াল্‌শের একাগ্রতা, পরিশ্রমের গল্প। ১৯৯৭-এ ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে ভারতীয় দলের একটি টেস্ট ম্যাচ ছিল বার্বাডোজে। ম্যাচের আগের দিন ভাল ঘুম হয়নি সিধুর। ভোর সাড়ে চারটেয় তিনি উঠে চলে আসেন হোটেলে তাঁর ঘরের ব্যালকনিতে। সেখানে দাঁড়িয়ে অন্ধকারের মধ্যে তিনি দেখেন, কে যেন দূরে দৌড়ে যাচ্ছেন। কিছুক্ষণ পরে মূর্তিটি কাছাকাছি আসতে বোঝা যায়, তিনি ওয়াল্‌শ। ভোরবেলাতেই তিনি নেমে পড়েছেন ট্রেনিংয়ে। পরের দিন টেস্ট, খ্যাতির মধ্যগগনে থেকেও পরিশ্রমে ঘাটতি নেই। এই হচ্ছেন কোর্টনি ওয়াল্‌শ। যথার্থ পরিশ্রমী ক্রিকেটার।

দীর্ঘদিন ধরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের পেস বোলিংয়ের প্রধান অস্ত্র কার্টলে অ্যামব্রোস-কোর্টনি ওয়াল্‌শ জুটি। পেসের স্বর্ণযুগের নায়ক কিন্তু তাঁরা নন, সেটা ছিল ক্লাইভ লয়েডের আমলে, সারা বিশ্বে ব্যাটস্‌ম্যানদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন রবার্টস-হোল্ডিং-গারনার-মার্শাল। তাৎপর্যপূর্ণ, স্বর্ণযুগের সেই কুশীলবদের সবাইকে সাফল্যে অনেক পেছনে ফেলে দিলেন ওয়াল্‌শ। ছয় ফুট দুই ইঞ্চির ওয়াল্‌শ কোনওদিনই গতিতে ব্যাটস্‌ম্যানদের কাছে বিভীষিকা হয়ে ওঠেননি। কিন্তু বোলিং স্কিল এবং স্ট্যামিনায় ওয়াল্‌শ তাঁর প্রজন্মের সব পেসারকে টেক্কা দিয়েছেন। ৪৩৫ উইকেট তারই পুরস্কার। ওয়াল্‌শের বোলিং সম্বন্ধে কপিলদেবের বিশ্লেষণ : ওঁর বোলিং অ্যাকশন এত জটিল যে, ওঁর বল খেলা খুব শক্ত। বলটা এত দেরিতে হাত থেকে ছাড়ে যে, কখন ছাড়ল তাই বুঝতে পারা যায় না। ওঁর বোলিং করার ধরন অ্যালান ডোনাল্ড, ওয়াকার ইউনুস বা গ্লেন ম্যাকগ্রাথের মতো সহজ সরল নয়। ওরা আপনাকে প্রস্তুতির জন্য অতিরিক্ত কিছু সময় দেবে। ওয়াল্‌শ নয়। হঠাৎই আপনার ঘাড়ে এসে পড়বে ও এবং ওঁর বল একেবারে সঠিক লেংথের।" কপিল উল্লেখ করেছেন ওয়াল্‌শের অন্য এক বৈশিষ্ট্যের : "শুধু কঠোর পরিশ্রম করে এত বড় বোলার হওয়া যায় না। ও ক্রিকেটকে ভালবাসে। দেশকে ভালবাসে। ও অন্য মানুষ।"

সত্যিই ক্রিকেটজগতে অন্য মানুষ কোর্টনি ওয়াল্‌শ। গত ১৬ বছর ধরে তিনি তারই প্রমাণ দিয়ে চলেছেন। ফাস্ট বোলার বলতেই রাগী, বদমেজাজি যে চরিত্র ভেসে ওঠে, তার ছিটেফোঁটাও দেখা যায় না ওয়াল্‌শের মধ্যে। তাঁকে আজ পর্যন্ত মাঠে মাথা গরম করতে দেখা যায়নি। এবং ক্রিকেটের ন্যায়-নীতিকেই তিনি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন বরাবর। ১৯৯৬-এর বিশ্বকাপে তিনি এর প্রমাণ দেন। পাকিস্তানের সেলিম জাফর 'নন স্ট্রাইকার এন্ড'-এর বাইরে চলে যাচ্ছিলেন প্রায়ই। তখন ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। প্রায় শেষ লগ্ন। একটা উইকেট ফেলতে পারলেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ চলে যাবে সেমিফাইনালে। বল করছিলেন ওয়াল্‌শ, কাদিরকে। হঠাৎ একটা বল করতে এসে থমকে দাঁড়ালেন ওয়াল্‌শ, ক্রিজের অনেক বাইরে তখন জাফর। 'স্টাম্প' ভাঙার ভান করলেন তিনি। ভাঙলেন না। জাফরকে সতর্ক করে দিয়ে ফিরে গেলেন রান-আপে। ভাঙলে অবশ্যই রান আউট হতেন জাফর। জিতে যেত ওয়েস্ট ইন্ডিজ। শেষ পর্যন্ত হেরে গেল তারা। জিতলেন কিন্তু ওয়াল্‌শ —তাঁর ন্যায়-নীতিতে। জেতালেন ক্রিকেটের ঐতিহ্যকে সারা বিশ্বের ক্রিকেট-সমাজ গর্বিত হয়ে উঠল ওয়াল্‌শ-এর এই আচরণে। ১৯৯৮-এ ওয়াল্‌শের জায়গায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক করা হয় ব্রায়ান লারাকে। জামাইকার সাবাইনা পার্কে অধিনায়কত্বের প্রথম দিনে লারাকে জড়িয়ে ধরে মাঠে নিয়ে যান ওয়াল্‌শ। কারণ তাঁর নিজের শহরে ক্ষুব্ধ দর্শকরা রেগে গিয়ে লারাকে অপমান করতে পারেন। সে সুযোগ দিতে চাননি ক্রিকেটের ভদ্রলোক কোর্টনি ওয়াল্‌শ।

ক্রিকেটজগৎ-থেকে ন্যায়-নীতি, ভদ্রতা, সৌজন্যবোধ, মনুষ্যত্ব যখন হারিয়ে যেতে বসেছে তখন ওয়াল্‌শের মতো খেলোয়াড় তরুণ প্রজন্মের কাছে আদর্শ হয়ে উঠতে পারেন। ওয়াল্‌শ বলেছেন, "জয়-পরাজয়, ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে ন্যায়-নীতিটাই আমার কাছে বড়।" আর এই সেদিন টেস্টে সবচেয়ে বেশি উইকেট পাওয়ার বিশ্বরেকর্ড করার পর বলেছেন, "কোনও ব্যক্তিগত লক্ষ্য নিয়ে আমি খেলি না। আমার একটাই লক্ষ্য, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে সফল দেখা। এ ছাড়া আমি খেলার আনন্দে খেলি। রেকর্ডের কথা ভেবে কখনও খেলা যায় না। রেকর্ড খেলতে-খেলতেই হয়ে যায়।" খেলতে-খেলতেই আজ সবার সেরা কোর্টনি ওয়াল্‌শ—মাঠে। এবং মাঠের বাইরে মানুষ হিসেবে, ক্রিকেটের সেরা প্রতিনিধি হিসেবে।

টেস্টে সেরা ১০ বোলার

বোলার	দেশ	ম্যাচ	উইকেট	গড়	সেরা বোলিং	পাঁচ বা তার বেশি উইকেট
কোর্টনি ওয়াল্‌শ	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	১১৪	৪৩৫	২৫.২৪	৭-৩৭	১৭ বার
কপিলদেব	ভারত	১৩১	৪৩৪	২৯.৬৪	৯-৮৩	২৩ বার
রিচার্ড হ্যাড্‌লি	নিউজিল্যান্ড	৮৬	৪৩১	২২.৩০	৯-৫২	৩৬ বার
ওয়াসিম আক্রম	পাকিস্তান	৯২	৩৮৩	২৩.১২	৭-১১১	২২ বার
ইয়ান বোথাম	ইংল্যান্ড	১০২	৩৮৩	২৮.৪০	৮-৩৪	২৭ বার
কার্টলে অ্যামব্রোস	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	৯০	৩৭৭	২১. ১২	৮-৪৫	২২ বার
ম্যালকম মার্শাল	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	৮১	৩৭৬	২০.৯৪	৭-২২	২২ বার
শেন ওয়ার্ন	অস্ট্রেলিয়া	৮৩	৩৬৩	২৫.৮৯	৮-৭১	১৬ বার
ইমরান খান	পাকিস্তান	৮৮	৩৬২	২২.৮১	৮-৫৮	২৩ বার
ডেনিস লিলি	অস্ট্রেলিয়া	৭০	৩৫৫	২৩.৯২	৭-৮৩	২৩ বার

ফার্স্ট হয়েও বাদ পড়ে ঘুরে দাঁড়ালেন জয়নার

ফ্লোরেন্স গ্রিফিথ জয়নার

একেবারে অন্ধকার পৃথিবী থেকে আলোয় উঠে এসেছেন ফ্লোরেন্স গ্রিফিথ জয়নার। কীভাবে? জানিয়েছেন সম্রাট রায়।

দেখতে দেখতে বারো বছর কেটে গেল। কিন্তু '৮৮ সালে ১০০ এবং ২০০ মিটার দৌড়ে জয়নারের গড়া দুরন্ত রেকর্ড দু'টি আজও অস্পর্শিত অহঙ্কার নিয়ে দাঁড়িয়ে। অল্প ক'দিন আগে হঠাৎই মারা গেলেন জয়নার। কিন্তু তাঁর রেকর্ড দুটির গায়ে এখনও ধুলো পড়েনি।

একদা রানিং ট্র্যাকের বুক চিরে ফ্লোরেন্স গ্রিফিথ জয়নারের উড়ন্ত ভঙ্গি দেখে বিমুগ্ধ দর্শকরা তাঁর নাম দিয়েছিলেন, 'ফ্লো-জো'। দৌড় তো নয়, যেন পাখা মেলে উড়ে যাওয়া। টিভি, নানারকম ম্যাগাজিন এবং খবরের কাগজের দৌলতে সকলেরই জানা হয়ে যায়, অ্যাথলেটিক্স-এর সঙ্গে ফ্যাশন ব্যাপারটাও চালু করেছিলেন তিনি। এবং সেটা স্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়েই। দৌড়ের সঙ্গে দর্শকের দৃষ্টি কীভাবে নিজের দিকে টেনে নেওয়া যায়, সেটা খুব ভালই বুঝতেন। পরতেন 'ওয়ান-পিস' পোশাক। কখনও একটা পা থাকত স্কিন-টাইট স্ল্যাক্স-এ ঢাকা, অন্য পা আগাগোড়া উন্মুক্ত। হাতের ইঞ্চি পাঁচেক লম্বা, সযত্নবর্ধিত নখে লাগাতেন নীল, সাদা এবং লাল রঙের (আমেরিকার জাতীয় পতাকা যে তিনটি রঙে তৈরি) 'নেলপালিশ'। কখনও মাথার চুল পেছন দিকে 'ইলাস্টিক ব্যান্ড' দিয়ে ঝুঁটি করে বাঁধা, কখনও-বা এলোকেশী। 'ট্র্যাক-কুইন' একই সঙ্গে ছিলেন 'ফ্যাশন-কুইন'ও।

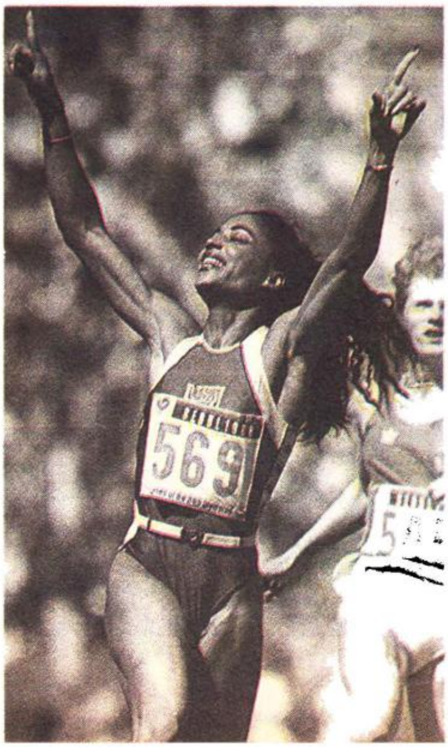

১৯৮৮-এর সোল ওলিম্পিকে ১০০ মিটার দৌড়ে সোনা জেতার পর ফ্লোরেন্স গ্রিফিথ জয়নার

ডিলোরেজ ফ্লোরেন্স গ্রিফিথ জয়নার কিন্তু আলোয় উঠে এসেছেন একেবারে অন্ধকার জগৎ থেকে। বাবা-মায়ের ১১টি সন্তানের একজন ফ্লোরেন্স। লস অ্যাঞ্জেলিসের যেখানে তাঁরা থাকতেন সেখানে দিনে-দুপুরে গুলিগোলা চলত। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ছিল এককথায়, ভয়াবহ। একদিন এরকম একটা সকাল হঠাৎই রক্তাক্ত হয়ে উঠেছিল যখন একটা মৃত্যুবাহী বুলেট ফুটো করে দিয়েছিল ভাইয়ের বুক। একটু তফাতে দাঁড়িয়ে বিস্মিত, আতঙ্কিত ফ্লোরেন্স সেদিন দেখেছিলেন রক্তের স্রোত আর পথের ধুলোর মধ্যে কাতরাতে-কাতরাতে তাঁর ভাইয়ের যন্ত্রণাক্লিষ্ট শরীর আস্তে-আস্তে নিথর হয়ে গেল। ফ্লোরেন্সের যখন খুব অল্প বয়স, তখন তাঁর বাবা এবং মায়ের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। মাথার ওপর ছাউনি নেই, পেটে খাবার নেই, সুস্থভাবে বাঁচার কোনও আশাই নেই। এই অবস্থায় ভেসেই যাওয়ার কথা। যাননি। দৌড়টাকে খুব ভালবাসতেন। ভালবাসার সেই টানেই আর বেপথে পা বাড়াতে পারেননি ফ্লোরেন্স।

এই সময় হঠাৎই সুযোগ পেয়ে গেলেন সুগার রে রবিনসন স্মৃতি প্রতিযোগিতায় দৌড়বার। প্রথম সুযোগেই বাজিমাত। 'ফার্স্ট' হওয়ার সুবাদে পেয়ে গেলেন সানফ্রান্সিসকো ঘোরার সুযোগ। চ্যাম্পিয়ানের মতো দৌড়তে পারলে দেশ-বিদেশ ঘোরা যায়, ভাল খাওয়া যায়, থাকার জায়গাও মেলে। এসব ভেবেই আরও ভালভাবে দৌড়ের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন জয়নার। এবং পরের বছর আবার প্রথম হলেন। কিন্তু পুরস্কার নেওয়ার সময় সেই দুঃসংবাদটা তাঁকে স্তম্ভিত করে দিল। যে বয়স্ক ভদ্রলোক পুরস্কার হাতে তুলে দিচ্ছিলেন, তিনি খুব মিষ্টি-মিষ্টি করেই বলেছিলেন, "তুমি তো আগের বছর বাইরে ঘোরার সুযোগ পেয়েছিলে। এবার টেক্সাস ঘোরার সুযোগটা অন্য কাউকে দিতে চাই।" প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়ার পরেও এমন কঠিন, নিষ্ঠুর শব্দ তাঁকে শুনতে হবে ভাবতে পারেননি। কাঁদতে-কাঁদতে মঞ্চ থেকে আসার সময় চিৎকার করেই ফ্লোরেন্স বলে ফেলেছিলেন, "তুমি একটা হৃদয়হীন মানুষ। আমি তোমাকে মোটেই পছন্দ করি না।" অনেক পরে জেনেছিলেন সেই ভদ্রলোকের নাম—জেসি ওয়েন্স।

তবে টেক্সাস ঘোরার সুযোগ নষ্ট হওয়ায় ভেঙে পড়েননি জয়নার। ওই ধাক্কাটাই তাঁকে মনে-মনে আরও জেদি, সচেতন করে তোলে। শেষপর্যন্ত টেক্সাসে কে গিয়েছিলেন ইতিহাস তা মনে রাখেনি। কিন্তু প্রথমে কাছের মানুষ, পরে আমেরিকা এবং সবশেষে গোটা বিশ্ব জেনে গেল, কোচ বব কার্সির কঠোর ট্রেনিং, স্নেহ এবং ধারাবাহিক উৎসাহে পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি লম্বা, ১৩০ পাউন্ড ওজনের একটা মেয়ের শরীর কীভাবে দু' পায়ে জয়ের ঝিলিক জাগিয়ে হাজির হল 'রানিং ট্র্যাক'-এ। শত মিটারে ১০.৪৯ সেকেন্ডের বিশ্বরেকর্ড আগেই ছিল, '৮৮ সোল ওলিম্পিকে ২০০ মিটারে ২১.৩৪ সেকেন্ডের বিশ্বরেকর্ড গড়ার পর খুশিতে আপ্লুত কোচ বব কার্সি বলেছিলেন, "এই অবাধ বিস্ফোরক গতি আর মসৃণতা নিয়ে কখনও কাউকে ছুটতে দেখিনি। যেন 'সিক্সথ গিয়ার'-এর সন্ধান পেয়েছে ফ্লোরেন্স।"

ফুলব্যাক

মানস চক্রবর্তী

আজকের প্রজন্মের কাছে শৈলেন মান্নার নাম হয়তো তেমনভাবে পৌঁছয়নি। কিন্তু ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে তিনি এক প্রবাদপুরুষ। খেলার মাঠের বাইরেও তাঁর জীবন নানা নাটকীয় মুহূর্তে উচ্ছ্বল। বলিষ্ঠ ও ঋজু চরিত্রের এই মানুষটির পরিচয় তুলে ধরা হচ্ছে এই ধারাবাহিক রচনায়।

৮

লন্ডন ওলিম্পিকের জন্য ফুটবল শিবির বসেছিল শিলংয়ে। কারণ শিলংয়ের ঠাণ্ডা আবহাওয়ার সঙ্গে মিল আছে লন্ডনের। তখন কোচ কথাটা সেভাবে চালু হয়নি। বলা হত ট্রেনার। বলাইদাস চ্যাটার্জিই হলেন ট্রেনার। বলাইদাসের মতো মানুষ আজকের দিনে বিরল। এ-বছর বলাইদাসের জন্মশতবর্ষ। কিন্তু সেভাবে বলাইদাসের জন্মশতবর্ষ পালিত হল না। শালপ্রাংশু চেহারা ছিল বলাইদার। সেন্টার হাফ খেলতেন। তবে সেটাই তাঁর একমাত্র চেহারা নয়। তিনি ছিলেন একজন বড় মাপের অ্যাথ্‌লিট। তখনকার দিনে ডেকাথলন ইভেন্ট ছিল না। থাকলে বলাইদাস সেই বিভাগেও ভারতসেরা হতে পারতেন। ১০০ কিংবা ২০০ মিটার, হার্ডল্‌স, জ্যাভলিন, ডিসকাস, হ্যামার থ্রো—সবেতেই তিনি প্রথম হতেন। এ ছাড়া হকি, বাস্কেটবল, কিংবা ক্রিকেটেও ছিলেন পারদর্শী। ভাল বক্সার ছিলেন। চেহারাও ছিল বক্সারদের মতো। কলকাতায় বেসবল এবং রাগবি খেলার সূত্রপাত করেছেন তিনি। দীর্ঘদিন মোহনবাগানের ট্রেনার ছিলেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে উজ্জ্বলতম হলেন চুনি গোস্বামী।

শিলংয়ের ওলিম্পিক ট্রায়ালে ফুলব্যাক ছিল পনেরোজন। টিমে নেওয়া হবে মাত্র তিনজনকে। বোঝাই যাচ্ছে কীরকম তীব্র লড়াই ছিল টিমে ঢোকার। পাহাড়ঘেরা ছোট্ট শহর শিলং। প্র্যাকটিস চলল দু'বেলা। সকালে ফিজিক্যাল ট্রেনিং দিতেন এক মিলিটারি অফিসার। বিকেলে ফুটবল নিয়ে ট্রেনিং দিতেন বলাইদাস। মিলিটারি-অফিসার ছিলেন খুব কড়া। ফলে অনেকেই, অভ্যেস না থাকার জন্য পিছিয়ে পড়তে বাধ্য হল। প্রতিদিন বিকেলেই ট্রায়াল ম্যাচ হত। নির্বাচন কমিটির তিন সদস্য। মণীন্দ্র দত্ত রায়, খলিফা জিয়াউদ্দিন এবং জ্যোতিষচন্দ্র গুহ। তিনজনই ভারতীয় ফুটবলের বিশিষ্ট কর্মকর্তা। এঁদের তিনজনের সম্পর্কেই অনেক কথাও বলা যায়। লেখা যায়। আপাতত আমরা লন্ডন ওলিম্পিক নিয়েই কথা বলছি।

তিন সপ্তাহের ক্যাম্প যখন হল তখন কলকাতায় লিগ চলছে। তাই মোহনবাগানের চার ফুটবলারের আর লিগ খেলা হল না। ডাঃ টি আও, মহাবীর প্রসাদ, অনিল দে এবং শৈলেন মান্না—এই চারজন শিবিরে চলে যাওয়ায় মোহনবাগান সেবার লিগ পায়নি। লিগ পেল মহমেডান। লিগের টপ স্কোরার হলেন মহমেডানের বচন। তবে শিল্ড চ্যাম্পিয়ান হল মোহনবাগানই। ফাইনালে হারাল ইস্টবেঙ্গলকে নয়, ভবানীপুরকে। এখন এসব গল্পকথা। '৪৮-এর শিল্ড রানার্স ভবানীপুর নেমে এসেছে এখন চতুর্থ ডিভিশনে। অথচ এক সময় তাদের দুর্ধর্ষ টিম ছিল। সেবারই তারা শিল্ড সেমিফাইনালে হারিয়ে দিয়েছিল ইস্টবেঙ্গলকে। ফাইনালে প্রথম দিন ১-১ ড্র হওয়ার পর, দ্বিতীয় দিন মোহনবাগান ২-১ গোলে জেতে। ভবানীপুরের নানী মিত্রের মতো কর্তা ময়দানে

খুব কমই এসেছেন। দু'হাতে টাকা খরচ করতেন তিনি। মনটা ছিল দরাজ। এতটাই যে, মহমেডানের গোলকিপার ইসমাইল বলতেন, "ওপরে আছেন আল্লা, মাটিতে নানীবাবু।" এই নানী মিত্র ভারতের ওলিম্পিক ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছেন। সে-কথায় আমরা পরে আসছি।

শিলংয়ে তিন সপ্তাহ ক্যাম্পের পর Probable এবং Possible—এই দুটো টিম করে অসমে কয়েকটি ম্যাচ খেলা হয়। এর মধ্যে একটি ম্যাচ হয়েছিল শিলচরে। শিলচরের সেই ম্যাচের কথা শৈলেন মান্নার স্মৃতিতে এখনও অম্লান। "শিলং থেকে শিলচর রাস্তাটা খুব সুন্দর। ঘণ্টা পনেরো লাগত তখনকার দিনে। এখন একটু কম লাগে। পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে খুব তো মেজাজে গেলাম শিলচরে। কিন্তু অমন রাস্তায় লম্বা জার্নিতে আমরা যে এমন অসুস্থ হয়ে পড়ব কে জানত? বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতের ফুটবলারদের অবস্থা সবচেয়ে বেশি কাহিল হয়ে পড়ল।"

শেষ ম্যাচে ট্রায়াল হল কলকাতায়। বলা হল, এই ম্যাচের পরেই চূড়ান্ত টিম ঘোষণা করা হবে। শিলং ক্যাম্পে ছিলেন না, এমন দু'জন ফুটবলারকে ওই ম্যাচে ডাকা হল। তাজ মহম্মদ এবং অনিল নন্দী। অনিলের কথা বলতে গেলে ওদের চার ভাইয়ের কথাই বলতে হবে। ভারতবর্ষের ফুটবল-ইতিহাসে এই চার ভাইয়ের স্মরণীয় অবদান আছে। ওঁরা চার ভাই অর্থাৎ অজিত, অনিল, সুনীল এবং নিখিল ভারতের হয়ে খেলেছেন। শেষ তিনজন আবার ওলিম্পিয়ান। ভারতীয় দলের সঙ্গে অজিত অস্ট্রেলিয়া সফর করেন ১৯৩৮ সালে। লন্ডন ওলিম্পিকে খেলেন অনিল এবং সুনীল। আর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিখিল ১৯৫৬-র মেলবোর্ন ওলিম্পিকে খেলেন। এক বাড়িতে চার ভাই-ই দেশের হয়ে খেলেছেন এরকম উদাহরণ পৃথিবীতে খুব বেশি নেই। পাকিস্তানের করাচির হানিফ মহম্মদরা চার ভাই টেস্ট খেলেছেন। ওয়াজির, হানিফ, মুস্তাক, সাদিক। চার ভাইয়ের দেশের হয়ে খেলার উদাহরণ নেই।

অনিল খেলতেন লেফ্‌ট হাফে। সুনীল লেফ্‌ট আউট। আর অনিলের সঙ্গে যাঁকে নেওয়া হল সেই তাজ মহম্মদ ছিলেন ফুলব্যাক। শেষ ট্রায়াল ম্যাচ হল তখনকার সি এফ সি মাঠে, এখনকার যা মোহনবাগান মাঠ। বিকেলে ট্রায়ালের পর টিম গড়া হবে। শৈলেন মান্না, পাপেন, ব্যোমকেশ বসুর সঙ্গে লড়াইয়ে চলে এলেন তাজ মহম্মদও। পাকিস্তানের কোয়েটার ফুটবলার ছিলেন তাজ। মহমেডান ছেড়ে ভবানীপুর গিয়েছিলেন। এবং তাঁর জন্যই সেবার শিল্ড ফাইনালে উঠেছিল ভবানীপুর।

"সেদিন রাতে টিম হলেও আমরা জানতে পারলাম পরের দিন সকালে খবরের কাগজ পড়ে। মামাদের ডাকে খুব ভেঙে গেল। বাড়ির সবাই এবং পাড়ার অনেকেই এসে জড়িয়ে ধরলেন। মনে হল, আমার জীবন ধন্য। স্বাধীনতার পরেই ভারত ওলিম্পিক ফুটবল খেলতে যাচ্ছে সেই দেশে যে-দেশ ১৯০ বছর আমাদের পরাধীন করে রেখেছিল। এবং যাঁরা শুরু করেছিলেন আমাদের দেশের ফুটবল।"

টিম হল : গোল : বরদারাজন (মহীশূর) এবং সঞ্জীব উচিল (বোম্বাই)। ব্যাক : তাজ মহম্মদ (বাংলা), পাপেন (বোম্বাই) ও শৈলেন মান্না (বাংলা)। হাফব্যাক : এস এ বসির (মহীশূর), ডাঃ টি আও (বাংলা), মহাবীর প্রসাদ (বাংলা), অনিল নন্দী (বাংলা), কাইজার (বাংলা), বি এন বজ্রভেলু (মহীশূর), আমেদ খান (মহীশূর), এস রামন (মহীশূর), ধনরাজ (মহীশূর), পি পবর (বোম্বাই), সাহু মেওয়ালাল (বাংলা), সুনীল নন্দী (বাংলা), রবি দাস (বাংলা)। অধিনায়ক : টি আও। কোচ : বলাইদাস চ্যাটার্জি (বাংলা), ম্যানেজার : মণীন্দ্র দত্ত রায় (বাংলা)। যুগ্ম ম্যানেজার : রামস্বামী আয়ার (মহীশূর)।

আগেই বলেছি, ভবানীপুরের নানী মিত্র জড়িয়ে আছেন ভারতের ওলিম্পিক ইতিহাসের সঙ্গে। এই যে দলটা হল, এতে তিনজনকে অতিরিক্ত তালিকায় রাখা হল। বলা হল, ওঁরা তিনজন দলের সঙ্গে যেতে পারবেন। তবে খরচ দিতে হবে নিজেদের। মোহনবাগানের অনিল দে এবং ইস্টবেঙ্গলের সুনীল ঘোষ এই শর্তকে অপমানজনক মনে করায় গেলেন না দলের সঙ্গে। কিন্তু ভবানীপুরের রবি দাসের খরচ দিলেন তাঁর ক্লাবের নানী মিত্র। তাই ওলিম্পিক দলের সঙ্গে লন্ডন রওনা হলেন রবি দাস।

তখন লন্ডন যেতে হত জাহাজে। বিমানে যাওয়া যেত। কিন্তু সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশের এত প্লেয়ারের বিমানখরচ জোগাবে কে? তবে হকি দল কিন্তু বিমানেই গিয়েছিল। কারণ হকি দল তখন ছিল ভারতের সবচেয়ে গর্বের বিষয়। তার আগে ১৯২৮, ১৯৩২ এবং ১৯৩৬ টানা তিনবার হকিতে সোনার পদক জিতেছে ভারত, সেবারও তারা তাই তারকা। ভারতের একমাত্র পদক পাওয়ার সম্ভাবনা তাদেরই আছে। সেবার ভারতের অধিনায়ক ছিলেন কিষেনলাল। বাংলা থেকে সেবার পাঁচজন ছিলেন ওলিম্পিক দলে। কেশব দত্ত, লেসলি ক্লডিয়াস, পি জ্যানসেন, জি গ্লকেন এবং নন্দী সিংহ। কেশব দত্ত পরের ওলিম্পিকেও দলে ছিলেন। তবে লেসলির মতো টানা চারটে ওলিম্পিক খেলায় রেকর্ড তাঁর নেই। লেসলি ১৯৪৮, ১৯৫২, ১৯৫৬ এবং ১৯৬০—টানা চারবার ভারতের হয়ে ওলিম্পিক খেলেছেন। তিনটি সোনা, একটি রুপো। অনন্য রেকর্ড। লেসলি ক্লডিয়াস কিন্তু ফুটবলার ছিলেন। কলকাতার মানুষ অবশ্য নন তিনি। তাঁর জন্ম বিলাসপুরে। বাবা আইরিশ, মা বার্মিজ। বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়েতে চাকরি পান ফুটবলার হিসেবে। বেটন কাপের খেলা দেখতে গিয়েছিলেন। বসেছিলেন গ্যালারিতে। প্রথম একাদশের সেন্টার হাফ না আসায় ওলিম্পিয়ান

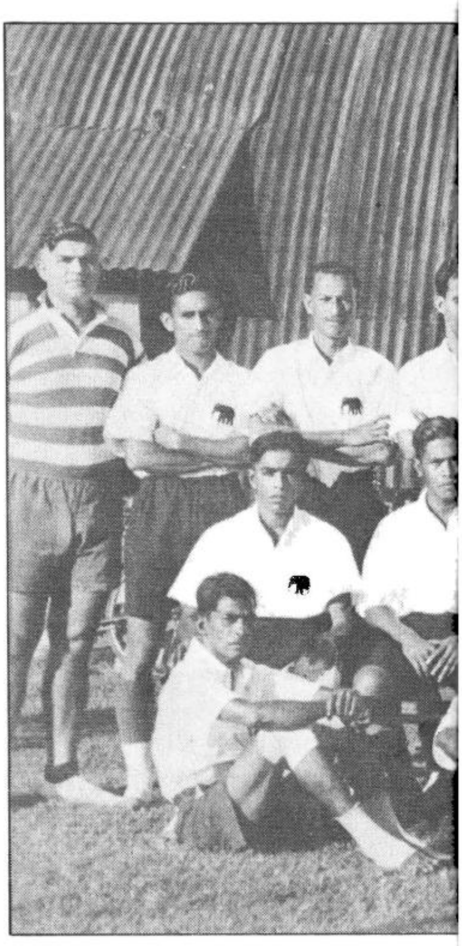

ডিকি কার তাঁকে ডেকে নেন। খাটো চেহারার ক্লডিয়াস সেই যে হকি খেলতে শুরু করেন, ছাড়লেন কুড়ি বছর পরে। ষাটের ওলিম্পিকে তিনি ছিলেন ভারতের অধিনায়ক। সেবার ভারত পাকিস্তানের কাছে হেরে রুপো পায়। তিনটি সোনা ও একটি রুপোর মালিক ক্লডিয়াস নিঃসন্দেহে বাংলার সর্বকালের সেরা ক্রীড়াবিদ। ক্লডিয়াসের তিনটি ওলিম্পিক সোনার পদকই এখন আর নেই। চুরি হয়ে গিয়েছে।

ফিরে আসা যাক লন্ডন ওলিম্পিকে ফুটবল দলের কথায়। শৈলেন মান্না বলছিলেন, "লন্ডন যাওয়ার জাহাজ যখন মুম্বই (তখনকার বোম্বাই) থেকে ছাড়ল, আমরা অনেকেই ভাবলাম, আগামী কুড়ি দিন কি তা হলে শুধু গল্পগুজব করেই কাটবে? অবশ্য সময় কাটানো নিয়ে চিন্তা ছিল না। কারণ টিমে ছিল মজাদার ধনরাজ। ধনরাজ চমৎকার গান গাইত। শুনেছি শচীনদেব বর্মনের কাছেও ও ভাল গান শিখেছিল। ওর গান আর হইচই আমাদের মাতিয়ে রাখবে সে-ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত ছিলাম।

"বলাইদা কিন্তু জাহাজেও প্র্যাকটিস চালু রেখেছিলেন। সকালে পি টি করতে হত। তারপর দড়িতে বল ঝুলিয়ে দেওয়া হত। আমরা

দু'পায়ে শট নিতাম। বল পেন্ডুলামের মতো দুলত। একদিন হল বিভ্রাট। আমি খুব জোরে ভলি নিতেই বল দড়ি ছিঁড়ে চলে গেল সমুদ্রের জলে। আমেদ ঠাট্টা করে গোলকিপার সঞ্জীবকে বলল, "কী হে দাঁড়িয়ে আছ কেন, বডি ফেলে বল নাও।

"ওলিম্পিকের কয়েকদিন আগেই লন্ডন পৌঁছে গেলাম। ওখানে কয়েকটা ছোট ক্লাব টিমের বিরুদ্ধে খেলে জিতলাম। সেই খেলাগুলোতে আমেদ আর রামনের পায়ের কাজ লন্ডনের দর্শকদের মুগ্ধ করল। ওলিম্পিক শুরু হওয়ার আগে একটা খবর আমাদের ক্যাম্পে আনন্দের জোয়ার এনে দিল। এতদিন জানতাম, বুট পরে খেলতেই হবে। কিন্তু সেদিন খবর এল খালি পায়েও খেলা যাবে। বিশেষ করে আমাদের উল্লাস ছিল দেখার মতো।"

ভারতের প্রথম ম্যাচ পড়ল ফ্রান্সের সঙ্গে। তখন তো ওলিম্পিকে খেলার জন্য কোয়ালিফাইং টুর্নামেন্ট হত না। সরাসরি খেলা যেত। ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্স, যে দলটির সম্পর্কে তেমন কোনও তথ্যই ছিল না ভারতীয়দের কাছে। তবে বিখ্যাত ব্রিটিশ কোচ এবং ফুটবলার টমাস কার্টিস এগিয়ে এলেন ভারতীয়দের সাহায্যে। আমেদ খান এবং রামনের খেলা তিনি দেখেছিলেন। জানতেন, ওই দু'জনের পায়ে ভাল ড্রিব্‌ল আছে। তিনি পরামর্শ দিলেন, "তোমরা ক্রমাগত ড্রিব্‌ল করে খেলো। তোমাদের ড্রিব্‌লে পর্যুদস্ত হলে ফরাসিরা মাথা গরম করবেই।"

"ফ্রান্সের সঙ্গে খেলা আমরা ভালভাবেই শুরু করলাম। গোলে বরদারাজন। দুই ব্যাক আমি আর পাপেন। তিন হাফ বসির, টি আও এবং মহাবীর প্রসাদ। ফরওয়ার্ড : বজ্রভেলু, পবর, ধনরাজ, আমেদ খান এবং রামন। এই রামন সম্পর্কে একটু বলার আছে। মহীশূরের এই ছেলেটি কোনওদিন কলকাতার কোনও ক্লাবে খেলেনি। তবে তা সত্ত্বেও বলছি আমার দেখা সর্বকালের সেরা লেফ্‌ট উইঙ্গার। হ্যাঁ, সালে কিংবা মাসুদ ফকরিকে মনে রেখেই বলছি। বাঁ পায়ে অসাধারণ কাজ ছিল। ডান পা যে খুব ভাল ছিল তা নয়। তবে বাঁ পা দিয়েই বাজিমাত করত। সালের গতি ছিল রামনের চেয়ে ভাল। কিন্তু রামনের ফুটবলের সঙ্গে ছিল বুদ্ধি। ওইরকম লেফ্‌ট উইঙ্গার ভারতে আর জন্মাবে না।"

ফ্লাড লাইটে আমরা সেই প্রথম খেলছি। আমাদের এগারোজনের মধ্যে শুধু পাপেন আর পবর বুট পরে খেলছে। প্রথমদিকে আমাদের মধ্যে একটু জড়তা ছিল। তাই একাধিক গোলের সুযোগ তৈরি করে ফ্রান্স এগিয়ে গেল। গোলকিপার বরদারাজনের কিছু করার ছিল না। গোলের খোঁচা খেয়ে আমেদ আর রামনের নেতৃত্বে ভারতীয় ফরওয়ার্ড লাইন কিন্তু এবার দারুণভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ড্রিব্‌লের পর ড্রিব্‌ল করে ওরা ব্যতিব্যস্ত করে তুলল ফরাসি ডিফেন্সকে।রামনকে গোলের একদম সামনে বিশ্রীভাবে ফাউল করল ওদের লেফ্‌ট ব্যাক। না হলে গোল হয়ে যেত। পেনাল্টি পেল ভারত।

"কে মারবে? দেশের মাটিতে পেনাল্টি এবং ফ্রি কিকে অনেক গোল করতাম। তাই কাজটা আমাকেই দেওয়া হল। তখন বলের লেস থাকত। ওই মুখের দিকটা গোলের দিকে রেখে আমি বল বসালাম। পেনাল্টি শট নিতে যাব, এমন সময় ওদের গোলকিপার ছুটে এসে লেসের মুখের দিকটা ওপরে রেখে বল বসিয়ে দিল। বেআইনি কিছু করেনি। কিন্তু কেন জানি না আমার মনের ওপর ভীষণ চাপ পড়ল। জোরে শট নিলাম। বল বারের কয়েক ইঞ্চি ওপর দিয়ে চলে গেল।

"কিন্তু তখন তো আর মাথা চাপড়াবার সময় নেই। পালটা আক্রমণ ঠেকাতে হবে। প্রাণ দিয়ে খেলতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরেই গোল শোধ করল রামন। মহাবীর বল দিয়েছিল আমেদ খানকে। আমেদ বাড়িয়েছিল রামনের দিকে। রামন কোনও ভুল করেনি।

"মাঠভর্তি দর্শক সদ্য স্বাধীন ভারতের খেলা দেখে নড়েচড়ে বসল। ইংল্যান্ডের লোকেরা যে সত্যিই ফুটবল ভালবাসেন তা বোঝা গেল, যখন সমবেত প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ওঁরাও আমাদের উৎসাহ দিলেন। খেলার ফল তখন ১-১, আমরা আরেকটা পেনাল্টি পেলাম। ওরা তখন প্রচণ্ড রাফ এবং টাফ ফুটবল খেলছিল। এবার পেনাল্টি শট নেবে কে?

"ক্যাপ্টেন টি আও মোহনবাগানের হয়ে অনেক গোল করতে দেখেছেন পেনাল্টিতে। তিনি বললেন, "মান্না, তুমিই মারো।" আমি কিন্তু রাজি হলাম না। ভাবলাম দুটো পেনাল্টি মিস করলে আর দেশে ফিরতে হবে না। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত পেনাল্টি শট নিতে গেল মহাবীর। ঠিকমতো লাগেনি। শটটায় জোর ছিল না। গোলকিপার সহজেই ধরে ফেলল। ২-১ গোলে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ আমরা হারালাম। আজ মনে হয় দ্বিতীয়বার পেনাল্টি না নিয়ে আমি অন্যায় করেছিলাম। একটা মিস করেছিলাম বলেই আমার উচিত ছিল, দ্বিতীয় পেনাল্টি থেকে গোল করে টিমকে এগিয়ে দেওয়া। তখন বয়স মাত্র তেইশ। তার ওপর ওলিম্পিক খেলার মানসিক চাপ। সব মিলিয়ে হয়তো ভুলই করেছিলাম। এই অনুশোচনা আমাকে সারাজীবন বয়ে বেড়াতে হয়েছে।"

(ক্রমশ)

জোর লড়াই কাউন্টিতে

দুর্যোগের ঘনঘটা ক্রিকেট দুনিয়াতে, এর মাঝেই ইংল্যান্ডের কাউন্টিতে শুরু হয়েছে সেরা ক্রিকেটারদের দক্ষতার লড়াই। এবারের কাউন্টি ম্যাচে স্টারের ছড়াছড়ি। এই প্রথম সেখানে খেলছেন বিশ্বের সেরা স্পিনার শেন ওয়ার্ন, থাকছেন সাড়া-জাগানো পেস বোলার শোয়েব আখতার, অভিজ্ঞ ফাস্ট বোলার গ্লেন ম্যাকগ্রাথ, স্পিনের সেরা ব্যাটস্‌ম্যান হিসেবে কথিত রাহুল দ্রাবিড়, চতুর ও অভিজ্ঞ স্পিনার অনিল কুম্বলে। প্রধান আকর্ষণ ভারত-অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় অবশ্য ল্যাঙ্কাশায়ারের হয়ে প্রথম ম্যাচে তেমন রান করতে না পারলেও তাঁর ওপরেই ভরসা রেখেছেন কর্মকর্তারা। কারণ তাঁদের আশা, গতবারের রানার্স ল্যাঙ্কাশায়ারকে এবার কাউন্টি চ্যাম্পিয়ান করতে বড় ভূমিকা নেবেন সৌরভ। সেজন্যই ক্লাইভ লয়েডের পর দীর্ঘদিন বাদে তাঁরা একজন ব্যাটস্‌ম্যান দলে নিলেন। রাজার হালে সৌরভকে রেখেছেনও তাঁরা—ম্যাঞ্চেস্টারের অভিজাত এলাকায় আধুনিক অ্যাপার্টমেন্ট ছাড়াও দেওয়া হয়েছে নতুন মার্সিডিজ গাড়ি। কাউন্টিতে এবারই প্রথম চালু হল 'রেলিগেশন', ওঠা-নামার খেলা। এসেক্সের দল এবার ভাল নয়, নাসের হোসেন জাতীয় দলে ব্যস্ত থাকায় এবার তাঁর পুরনো দলে খেলছেন না। চ্যাম্পিয়ানশিপের লড়াইয়ে আছে গ্ল্যামারগান, কেন্টও। কেন্টে এবারে যোগ দিলেন রাহুল দ্রাবিড়।

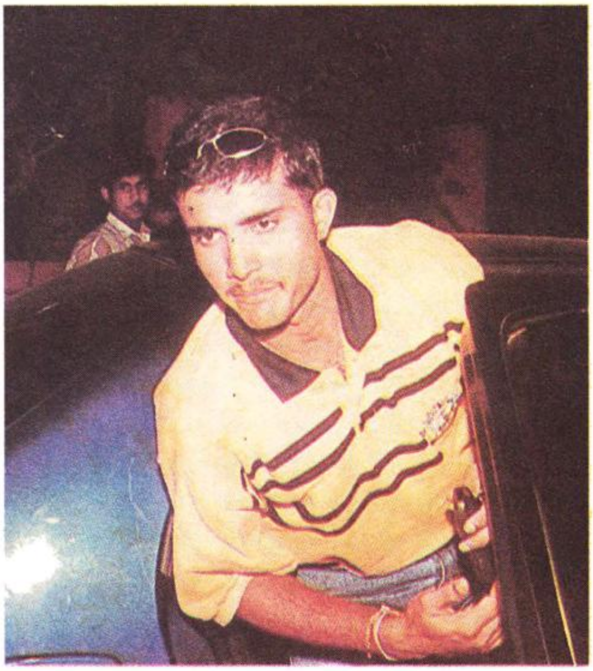

শোয়েবের জুতো

এখন বিশ্বে সবচেয়ে দ্রুতগতিতে বল করেন পাকিস্তানের শোয়েব আখতার। সবচেয়ে দূর থেকে ছুটেও আসেন তিনি। এর ফলে পায়ের ওপর চাপও কম পড়ে না। সেই চাপ কমাতে এখন বিশেষ ধরনের জুতো পরছেন শোয়েব। এই জুতো পাকিস্তানে পাওয়া যায় না। বার্মিংহামের একটি কোম্পানি বিশেষভাবে শোয়েবের জন্য এই জুতো তৈরি করে দিয়েছেন। একজোড়ার দাম ৫৩০ পাউন্ড স্টার্লিং। শোয়েব একসঙ্গে ১০ জোড়া কিনে নিয়েছেন।

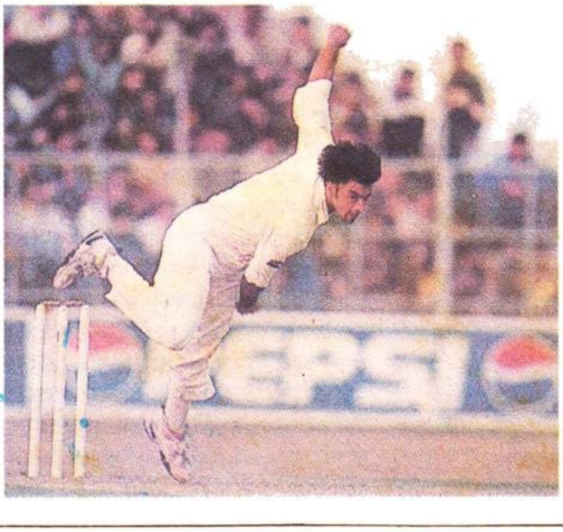

ম্যাথুজের জনপ্রিয়তা

'ফুটবল সম্রাট' পেলে আমেরিকার কসমস ক্লাবের হয়ে ফুটবল খেলতে গিয়ে সে-দেশে যে সম্মান পেয়েছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব ও জনপ্রিয়তা পাচ্ছে জার্মানির সুপারস্টার লোথার ম্যাথুজ। সর্বাধিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার রেকর্ড গড়ে বড় আসর থেকে অবসর নিলেন তিনি। তারপরই নিউ ইয়র্ক-নিউ জার্সির মেট্রো স্টার্স ক্লাবের হয়ে খেলার বিরাট আর্থিক অফারে সাড়া দিয়ে আমেরিকায় এসেছেন ম্যাথুজ। ক্লাবের প্রদর্শনী ম্যাচে খেলার পর ম্যাথুজের প্রতিক্রিয়া : "এত লোক আমার খেলা দেখতে এসেছেন জেনে আমার রোমাঞ্চ লাগছে।" বস্তুতপক্ষে ম্যাথুজ সত্যিই আমেরিকায় সাড়া জাগিয়েছেন। যে-দেশ বাস্কেটবল, বেসবলের ভক্ত, সে-দেশে রাতারাতি অনেক ফুটবল-প্রেমিক তৈরি করে ফেলেছেন ম্যাথুজ।

লেভার এখন

তিনিই একমাত্র খেলোয়াড়, যিনি ১৯৬২ এবং ১৯৬৯ সালে দু'বার গ্র্যান্ড স্লাম পুরস্কার পান, একটি 'অ্যামেচার' দশকে অন্যটি 'ওপেন এরা'-তে। সেই টেনিসের কিংবদন্তি রড লেভার অনেক চেষ্টার পর সুস্থ হয়ে উঠছেন। ৬২ বছরের লেভারের হঠাৎ স্ট্রোক হয়, শরীরে ডান দিকটা প্রায় অসাড় হয়ে যাচ্ছিল। অনেক শারীরিক লড়াইয়ের পর সেটা আটকেছেন লেভার। এখন গল্‌ফ খেলছেন নিয়মিত, টেনিস খেলছেনও মাঝেমধ্যে। আধুনিক টেনিস-তারকারা অনেকেই লেভারের ভক্ত। আন্দ্রে আগাসির তো প্রিয় খেলোয়াড় হলেন রড লেভার।

দর্শক

বাচ্চারা শোনো !
বিশ্বমানের আর্ট মেটিরিয়াল সম্ভার
তোমাদের জন্যে এল এবার।
রঙগুলি কত ঝলমলে।
শেডগুলি একদম ঠিক বলা চলে।
স্কুল হোক, শখ বা মজায়,
সবার জন্যে চাই-ই চাই !
গিডিলাইট
অ্যাক্রন
কল্পনার পাখা মেলে দাও
• পোস্টার কালার • অয়েল কালার • ওয়াটার কালার কেক ও টিউব
• অয়েল প্যাস্টেল • ওয়াক্স/প্লাস্টিক ক্রেয়ন্স • পেপার গ্লিটার্স
ক্যামেল -এর প্রস্তুতকারকদের পক্ষ থেকে
PUBLICIS·ZEN PID 171 99 BEN

ANANDA[illegible] 2000 REGD NO. WB/CC/264
MH/MBI-S[illegible]99 TN/MS(C) 731. RS. 10.00

INSTA-WHITENING SYSTEM™

একমাত্র উজালা সুপ্রীমে আছে অভিনব **ইনস্টা হোয়াইটেনিং সিস্টেম**™ (IWS), যা আপনার জামাকাপড়ে এনে দেয়, এক চোখধাঁধানো উজ্জ্বলতা। এবং উজালার এমনই শক্তি যে লিটার জলে মাত্র চার ফোঁটাই যথেষ্ট। তাই কেবল উজালাই দিতে পারে এক নতুন সাদা - উজালা সাদা।

শুভ্রতার নতুন রং

A product of Jyothy Laboratories Ltd. উজালা সুপ্রীম এখন বাংলাদেশে পাওয়া যাচ্ছে।

Situations/JL 287/2000 Ben